মায়ের জন্য
বইটি আনা হয়েছে

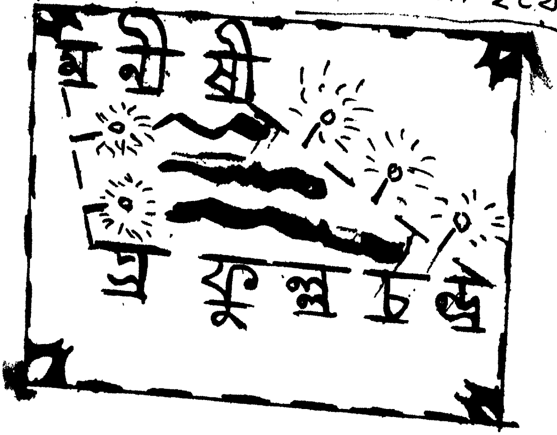
মনীষী
প্রফুল্লচন্দ্র

মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন কথা)

শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায়

বুক করপোরেশন লিমিটেড
১।১ গোপাল বসু লেন
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :—
বুক করপোরেশন লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীশঙ্করী প্রসাদ ঘোষ

মূল্য—দুই টাকা

প্রিণ্টার—প্রবোধ ঘোষ
গোরাচাঁদ প্রেস
১৪, মদন মিত্র লেন

প্রকাশকের কথা

ভারতবর্ষের অবস্থা অনিশ্চয়তাপূর্ণ—বাংলার অবস্থা জটিল। জাতি দ্বিধা বিভক্ত ও বিভ্রান্ত; তার চিন্তাধারা কুটিলপথগামী। যুগপদ্ ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া জাতি অগ্রসর হচ্ছে—নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিবেশে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিরূপ পরিণতি লাভ করবে সে সম্পর্কে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ নীরব। বিভিন্ন মতবাদের প্রত্যেক লোক তার আদর্শানুযায়ী ভারতকে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। এমন সময় দেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন কথা আলোচিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রফুল্লচন্দ্র একাধারে আদর্শ শিক্ষক—আদর্শ বৈজ্ঞানিক, আদর্শ সমাজ সেবক—সর্ব্বোপরি আদর্শ মানুষ। তিনি একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার কথা আলোচিত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, দেশব্রতী—প্রত্যেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারেন। সেইজন্য—"মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র" প্রকাশিত হইল।

লেখক প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের ঘটনাগুলিকে কোন প্রাধান্য দেন নাই। ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মহৎ মন পিছনে ক্রিয়াশীল থাকিয়া ঐ সকল ঘটনা সম্ভব করিয়াছে, তাহাকেই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সে মন সম্পূর্ণ ভারতীয়—সাধনায়-ত্যাগে ও মানবপ্রীতিতে সমৃদ্ধ। এই মহৎ মনের স্পর্শে

আমরাও মহান্ হইয়া উঠি—ইহাই তাঁহার কামনা। বস্তুতঃ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের গুরুত্ব একটুও হ্রাস হয় নাই। জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতি তাঁহার কাম্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকৃত কর্ম্মোদ্যম আজ যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। লঘু উত্তেজনার আবর্ত্তে পড়িয়া জাতি আজ বিভ্রান্ত—কেন্দ্রচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় সে লক্ষ্যহারা হইয়া ছুটিতেছে। এই পরাধীন দেশে বিগত একশত বৎসর ধরিয়া যে বিরাট কর্ম্মোদ্যম—সর্ব্বক্ষেত্রে জীবনের যে কি অত্যাশ্চর্য্য বিকাশ সম্ভব হইয়াছে, তাহার উৎস কোথায় তাহাই আমাদের ধীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। জাতির উৎস কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, দেশবন্ধু ও নেতাজীর মত মহাপুরুষ এ পরাধীন দেশে কি করিয়া সম্ভব হইল? অধীনতার নিষ্পেষণ সত্ত্বেও জাতির প্রাণ-প্রাচুর্য্য এমন অব্যাহত ধারায় উৎসারিত হইল কি করিয়া?—তাহাই আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে। জাতির পক্ষে আত্মানুসন্ধান আজ অপরিহার্য্য। “মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র” সেই আত্মানুসন্ধানে সাহায্য করিবে। একজন পাঠকও যদি এই পুস্তক পাঠে উপকার লাভ করেন—আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

কলিকাতা
পৌষ, ১৩৫৪

প্রকাশক

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নবযুগের সন্তান। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাংলায় তথা ভারতে নব যুগের সূচনা হয়। মুসলমান আক্রমণের যুগ হইতে শত সহস্র বিধিনিষেধে আবদ্ধ হইয়া বাংলার সমাজ-জীবন আড়ষ্ট ও বুদ্ধি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এমনই সময়ে ভারতে ইংরাজের অভ্যুদয় হইল। ইংরাজের আবির্ভাব জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে যত অশুভই হউক না কেন, ইহার ফলে একটি বিকাশমান, প্রাণচাঞ্চল্যে বেগবান্ সভ্যতা বাঙ্গালীর নিদ্রিত জীবনের উপর আলোকপাত করিল। সেই আলোকে বাঙ্গালী যেন নূতন করিয়া বাঁচিয়া উঠিল। জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় তাহার নিজ জীবনের রিক্ততা সে যেন সুস্পষ্টভাবেই অনুভব করিতে পারিল। বাঁচিবার পরম আগ্রহে সে জীবনকে বন্ধনমুক্ত করিবে—তাহারই শুভ আহ্বান প্রথম শুনিতে পান—রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায় সংস্কারের যে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন, তাহারই পথ বাহিয়া বাঙ্গালীর জীবনের 'মরাগাঙে' বন্যার ঢল নামিয়া

আসিল—বিধিনিষেধের সমস্ত গণ্ডী দলিয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা চারিদিকে অবাধ প্রসারতার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। তাহার চলিবার পথে যাহাই বিঘ্ন সৃষ্টি করিল, তাহাকেই ভাঙ্গিয়া দলিয়া পিষিয়া তাহার গতিভঙ্গির অনুকূল করিয়া গড়িয়া লইতে চাহিল। এই ভাবে তাহার মন সংস্কারপ্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজের সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার, শাস্ত্রের সংস্কার, গতানুগতিক আচার ব্যবহারের সংস্কার—সবদিকেই সংস্কারের একটা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল।

এই নবজীবনের বার্ত্তা লইয়া সেই সময় যাঁহারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ইঁহাদের বলিষ্ঠ চিন্তা, অসাধারণ মনীষা ও স্বাধীন মতবাদ দ্বারা বাঙ্গালীর জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই সংস্কারক ছিলেন। বাঙ্গালীর স্রোতহীন জীবনে যে আবর্জ্জনা ও পঙ্কিলতা জমিয়া উঠিয়াছিল, ইঁহারা তাহা বিদূরিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন।

ভারতের রাজধানী কলিকাতাই তখন এই নূতন ভাবের কেন্দ্র ছিল। বাংলার পল্লীগুলি তাহার প্রাচীন পরিবেশের মধ্যে তখনও বেশ শান্তিতেই ঘুমাইতেছিল; নূতন ভাবের স্পর্শে তাহাদের বুক তখনও চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। কেবল স্থানে স্থানে এই নূতন চিন্তাধারার সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন দুই এক জন ব্যক্তির সহায়তায় তাঁহাদের বাস পল্লীতে এক একটি প্রগতি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল।

খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলি তেমনি একটি গ্রাম। যখন স্ত্রীশিক্ষার নামে দেশের লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, সেই সময় রাড়ুলিতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক হিসাবে তদঞ্চলে রাড়ুলিই অগ্রণী ছিল। ঐ গ্রামের প্রতিপত্তিশালী জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বাধার মুখে এই বিধবা বিবাহ সেদিন সম্ভব হইতে পারে নাই।

এমনি সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট তারিখে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, ইউরোপের তখন পূর্ণ যৌবন। তাহার জীবনের পাত্র হইতে প্রাণের রস একেবারে উপচিয়া পড়িতেছে। জীবন-সম্পদের গুপ্ত গৃহের দ্বার যতই উদ্‌ঘাটিত হইতেছে ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি ততই তাহাকে সম্মুখে আহ্বান করিতেছে। প্রত্যেক অগ্রবর্ত্তী পদক্ষেপ জীবনের সম্ভাবনার পরিসরকে যোজনাতীত বাড়াইয়া দিতেছে। অজানাকে জানিবার, অজেয়কে জয় করিবার পরিপূর্ণ আনন্দে দিশাহারা হইয়া সে সম্মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ, গবেষণা, আবিষ্ক্রিয়া এবং উদ্ভাবন তাহার জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে নূতন নূতন আলোকপাত করিতেছে। একনিষ্ঠ সাধক, অক্লান্ত কর্ম্মী, দুঃসাহসিক আবিষ্কারক এবং নাছোড়বান্দা উদ্ভাবকের আবির্ভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের পরিধি কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। বাস্তব ও মানস ক্ষেত্রে পশ্চিমের এই অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন প্রেরণা জাগাইয়া, বাঙ্গালীকে নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত করিয়া,

বৃহত্তর জীবন ও বিপুলতর সম্ভাবনার দিকে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতেছিল।

এই ভাবে প্রাচ্যমনের স্থায়ী গঠনের উপর পশ্চিমের প্রভাব পড়িয়া ভারতের ভাবী কালের সভ্যতার প্রাণকোষে যখন শক্তি-সঞ্চার হইতেছিল, এমনি সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই সভ্যতার সঙ্গতিপূর্ণ মিলন কি ভাবে তাঁহার জীবনে রূপায়িত হইয়াছিল, আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বংশ পরিচয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলি গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় চৌধুরী পরিবারে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী।

হরিশ্চন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বোধখানায় বাস করিতেন। বোধখানা—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের জন্মপল্লী পলুয়া মাগুরা হইতে তিন মাইল উজানে কপোতাক্ষী তীরে অবস্থিত। এখানকার রায় চৌধুরী বংশীয়েরা নবাব সরকারে কাজ করিয়া বিপুল অর্থ ও যশের অধিকারী হন। এই বংশের রামকৃষ্ণ রায় বাদশাহ প্রদত্ত জায়গীর লাভ করিয়া পরবর্ত্তীকালে রাড়ুলি আসিয়া বসবাস করেন। হরিশ্চন্দ্রের পিতামহ মাণিকলাল রায় প্রথমে কৃষ্ণনগরে, পরে যশোহরে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিতেন। ইঁহারাও প্রভূত উপার্জ্জন দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই উৎসাহ ও কর্ম্মকুশলতা গুণে কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

পিতৃপিতামহ হইতে সংক্রামিত গুণগুলি অনুকূল পরিবেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মানুষের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলে—ইহাই মনস্তাত্ত্বিকদিগের অভিমত। আমরাও প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব—উত্তরকালে যে লোকোত্তর চরিত্র ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা জগৎ-সভায় তাঁহার জন্য সম্মানের আসন আহরণ করিয়াছিল, তাহার বীজ কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোন্ অনুকূল পরিবেশ তাহার পরিপুষ্টির সহায়ক হইয়াছিল।

কিন্তু মানুষের সহিত প্রকৃতির আদান-প্রদান সর্ব্বদাই জীবনের সদর দরজা দিয়া হয় না। এমন কোন বিশিষ্ট পথ নাই, যে পথে চলিলে আমরা মানুষের জীবনের মূল রহস্যে যাইয়া পৌঁছিতে পারি বা প্রাণের সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখার সন্ধান পাই, যেখানে আহূত হইয়া বাহিরের সমস্ত জিনিসই তাহাদের বিশিষ্ট রূপ ত্যাগ করিয়া জীবনের অঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। সেই জন্যই বংশ তালিকা, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচারব্যবহার সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বলার পরও মহাপুরুষদের জীবন যেন রহস্যাবৃত থাকিয়া যায়। সহস্র ঘটনার বিপুল আবর্ত্ত হইতে হয়তো একটা তুচ্ছ ঘটনা—কর্ম্মমুখর জীবনে সহস্র রাগিণীর মাঝখানে হয়তো একটি অজ্ঞাত মৃদু সুর কেমন করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে জীবনদেবতা সকলের অজ্ঞাতে জীবনকে যেন বিশিষ্ট আকারে রূপায়িত করিয়া তুলেন।

মানুষের জ্ঞানের বাহিরে সেই মানস রাজ্যের রহস্যময় অনন্ত গম্ভীর বিশালতা! বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আজও সেখান হইতে ফিরিয়া আসে—মানুষের কল্পনা সেখানে প্রতিহত হয়। সেই দুর্জ্ঞেয় জীবন-বিকাশের ইতিহাস—কেমন করিয়া একটির পর একটি করিয়া -

জীবনের পাপড়িগুলি খুলিয়া খুলিয়া মনুষ্যত্বের অনন্ত বিচিত্রতায় জীবন বিকশিত হইয়া উঠে—তাহা আমরা জানিনা। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন পর্য্যালোচনা কালে পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে বাহ্য পরিবেশের সহায়তায় প্রফুল্লচন্দ্রের মত মহাপুরুষ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

হরিশ্চন্দ্র রায় প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা। রাড়ুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিপাশে কয়েকখানি গ্রাম লইয়া তাঁহার জমিদারী। সুতরাং যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার সহিতই তিনি রাড়ুলি গ্রামে বসবাস করিতেন। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে তাঁহার সমকক্ষ লোক ঐ অঞ্চলে বড় কেহ ছিল না। মার্জ্জিত রুচি ও শোভন আচরণ তাঁহার সকল কাজেই একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আঁকিয়া দিত। বাল্যকালে হরিশ্চন্দ্র এক মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে ইংরাজী শিক্ষার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে গমন করেন। কি চরিত্র মাহাত্ম্যে, কি পাণ্ডিত্যের গভীরতায় রামতনু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গ সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পাদমূলে বসিয়া শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য হরিশ্চন্দ্রের হইয়াছিল। পারিবারিক কারণে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়া তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উত্তরকালে, তিনি ইংরাজী শিক্ষাভিলাষী দেশবাসীর সুবিধার জন্য উইলসন্স্ ডিক্সনারী নামক একখানি ইংরাজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাও তিনি বেশ ভাল ভাবেই শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পারসীক কবি হাফিজ হরিশ্চন্দ্রকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিলেন।

হাফিজের কবিতা পাঠের ফলে তাঁহার মনের সংস্কারের বন্ধনগুলি শিথিল হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে সেই বন্ধনগুলি এখন তাঁহার মন হইতে একেবারে খসিয়া পড়িল। ভূগোল ও বিদেশী ইতিহাসের জ্ঞান জীবন ও সমাজ সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিল। যাহা অতীত, যাহা পুরাতন, যাহা গতানুগতিক, তাহারই সম্পর্কে একটা ক্ষুব্ধ বিদ্রোহের মনোভাব তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর পরিলক্ষিত হইত। হরিশ্চন্দ্রও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। নূতন জীবনের আস্বাদ ও স্বাধীন চিন্তাধারা বাঙ্গালীর ভাবজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার তরঙ্গ তাঁহারও মনকে দোলা দিয়াছিল।

রাড়ুলি একটি প্রগতিকেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একমাত্র হরিশ্চন্দ্রের চেষ্টায় ইহা সম্ভব ইয়াছিল। পল্লীতে পল্লীতে 'খাঁ গুরু'র (২) প্রতাপের তলায় শিশু 'পড়ুয়ার' চিত্তকোরক যখন শুকাইয়া উঠিতেছিল, মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন চিন্তা যখন গ্রামবাসীরা মনেও স্থান দিতে পারিত না, এমনই সময়ে হরিশ্চন্দ্র নিজ গ্রামে ছেলেদের জন্য মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও মেয়েদের জন্য প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করেন। সেই সময়ের সংবাদপত্র "সংবাদ প্রভাকর" ও "সংবাদ সাধুরঞ্জন" এই সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল। প্রায় একই সময়ে রাড়ুলির পাশাপাশি কাটিপাড়া গ্রামেও একটি (মধ্য) ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কাটিপাড়ার ঘোষবংশীয় জমিদারগণ এই কার্য্যের উদ্যোক্তা

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আগে মুসলমান পণ্ডিতেরা গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলিতেন। ইহাদের বেত্রদণ্ড ছাত্র তাড়নায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ছিলেন সত্য, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের উপদেশ ও পরামর্শ তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ বিদ্যার উপর হরিশ্চন্দ্রের অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। শুনা যায়, কলিকাতায় বাসকালে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর স্বীয় পত্নী ভুবনমোহিনীর শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই দূরতম পল্লীতে হরিশ্চন্দ্র নিজের জন্য মূল্যবান্ গ্রন্থসম্বলিত একটি গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আচার্য্যদেবের আত্মচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি—কেরীকৃত 'বাইবেলের অনুবাদ', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ও 'রাজাবলী', লসনের 'পশ্বাবলী' এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেন্‌সিস্' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার গ্রন্থাগারে ছিল। পল্লীতে বসিয়াও দেশের নবীন ভাবধারা ও জগতের আধুনিকতম ঘটনার সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনি বহু সংবাদ-পত্র ও সাময়িক-পত্রের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থসংগ্রহ, হিন্দু পত্রিকা, সোমপ্রকাশ—এই সকল সাময়িকী ও সংবাদপত্র তাঁহার গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার মার্জ্জিত রুচি ও সংস্কৃতির অনুকূল একটি জ্ঞান ও ভাবের ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল তাঁহার গৃহের মধ্যেই তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র রাড়ুলিতেই বসবাস করিতেন। কিন্তু কলিকাতার সঙ্গেই তাঁহার বেশী যোগ ছিল। কলিকাতার তৎকালীন শিক্ষিত ও প্রগতিশীল সমাজের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি কিছুকালের জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশন নামক জমিদারসভার সদস্যও মনোনীত হইয়াছিলেন। এই সমস্তই তাঁহার যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

হরিশ্চন্দ্র গ্রামাঞ্চলে প্রথম ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। তখন চোর ডাকাতের উপদ্রবে কাহারও সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ্ ছিল না এবং কোন নিরাপদ্ উপায়ে টাকা খাটাইয়া ধনবৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থাও দেশে ছিল না। হরিশ্চন্দ্র দেশের এই অভাব অনুভব করিয়া তাঁহার স্বগ্রামে একটি লোন্ আফিসের কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সততার জন্য হরিশ্চন্দ্র সকলেরই আস্থাভাজন ছিলেন এবং অনেকেই তাঁহার লোন্ আফিসে টাকা জমা দিয়াছিলেন। পরে এই কারবারে লোকসান ঘটিয়াছিল। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও সকলের আমানতি টাকা নিজ হইতে শোধ করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপ সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ পিতার পুত্র হওয়ার সৌভাগ্য প্রফুল্লচন্দ্রের হইয়াছিল। তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনীও যে তাঁহার পিতার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন—একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। ভুবনমোহিনী খুলনা জেলার অন্তর্গত ভাড়াসিমলা গ্রামে বিখ্যাত বসুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নবকৃষ্ণ বসু।

ভুবনমোহিনীর চরিত্র সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার মত উপাদান আমাদের নাই। বর্ত্তমান সমাজে যে মর্য্যাদাবুদ্ধি লইয়া সকলে নারীর কথা ভাবিতে শিখিতেছে, একশত বৎসর পূর্ব্বে নারী সম্পর্কে সেরূপ কোন অনুকূল মনোভাব সমাজের ছিল না। বর্ত্তমানের নারী আত্ম-সচেতন—আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোভাব তাঁহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট। সমাজও তাঁহাদের এই মনোভাব সমর্থন করিতেছে। অন্দরের বাহিরে সাধারণ ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতা নানাভাবে রূপায়িত

হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু শতবৎসর পূর্ব্বে নারী পরিবারসর্ব্বস্ব ছিলেন। সংসারের দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়া সুনিপুণ গৃহিণী হইয়া তাঁহারা গড়িয়া উঠিতেন। সংসারের বাহিরের জগতের সঙ্গে তাঁহাদের কোন যোগ ছিল না। তাহার উপর, ভুবনমোহিনী জমিদার গৃহের বধূ ছিলেন এবং জমিদার গৃহের বধূরা চিরদিনই অসূর্য্যম্পশ্যা থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাকে বুঝিতে, আমাদিগকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

যে শিল্পী চিত্রকে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তুলে, তাহাকে না দেখিলেও, চিত্র দেখিয়া সেই শিল্পীর দক্ষতা ও শিল্পচাতুর্য্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। সেইরূপ প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখিয়া ভুবনমোহিনী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা গড়িয়া তুলিতে পারিব। ভুবনমোহিনী প্রফুল্লচন্দ্রের মাতা। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহারই ক্রোড়ে শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যে প্রতিভার দীপ্তি ও চরিত্রের মাধুর্য্য দেশকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা যে আংশিক ভাবেও তাঁহার মায়ের চরিত্র হইতে প্রতিফলিত হয় নাই—একথা কে বলিবে?

ভুবনমোহিনীর মন যদি গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে পূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে দাম্পত্য জীবনের বাহ্য ঠাট বজায় থাকিলেও স্বামিস্ত্রীর অন্তর্লোকে একটি দুর্লংঘ্য ব্যবধান গড়িয়া উঠিত। কিন্তু আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মচরিত হইতে জানিতে পারি—প্রত্যেক সাংসারিক সমস্যায় হরিশ্চন্দ্র পত্নীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পরস্পরের এই সহযোগিতা দাম্পত্য-সদ্ভাবেরই পরিচায়ক। আরও বুঝিতে পারি—হরিশ্চন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর পরামর্শ মূল্যবান্ মনে করিতেন। বুদ্ধিমতী ও গুণবতী মহিলারাই সংসারে এই জাতীয় সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

হরিশ্চন্দ্রের প্রগতিশীল মনের ছোঁয়াচ ভুবনমোহিনীর মনেও লাগিয়াছিল। কলিকাতায় অবস্থান কালে হরিশ্চন্দ্র যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ভুবনমোহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহা ভুবনমোহিনীর জ্ঞানপিপাসু ও সংস্কারমুক্ত মনেরই পরিচায়ক। প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাত যাত্রায় মাতার সমর্থন—ঐ একই মনের পরিচয় প্রদান করে।

এইরূপ উদার পিতামাতার কোলে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে প্রফুল্লচন্দ্রের শিশুদেহ ও শিশুমন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। অনেক সুপণ্ডিত ও কৃতী পিতার পুত্রকে মূর্খ ও বিপথগামী হইতে দেখা যায়। পিতা-পুত্রের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের অভাবই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। পিতা সম্পর্কে মানুষ তাহার আদিম মনোভাব হইতে সম্পূর্ণ যেন মুক্ত হইতে পারে নাই। একটা ভয়ার্ত্ত সম্ভ্রম বোধ পুত্রকে পিতা হইতে দূরে রাখিয়া দেয়। পিতাও অনেক ক্ষেত্রে এই দূরত্বকে প্রশ্রয় দিয়া গৌরব বোধ করেন। ফলে পুত্রের মনের গঠন ও চরিত্রের প্রবণতা সম্পর্কে পিতা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যান। পিতার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পুত্রের পক্ষে কি প্রভূত কল্যাণপ্রদ হয়, মিলের আত্মজীবনী পাঠে তাহা আমরা জানিতে পারি। কেবলমাত্র পিতার শিক্ষাগুণে যোল বৎসর বয়সে দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া এই বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বিদ্বৎসমাজে সকলের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সহিতও তাঁহার পিতার ব্যবহার সরল, উদার ও কপট-গাম্ভীর্য্য-বর্জ্জিত ছিল। তিনি মুখে মুখে পুত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার সহিত গল্প করিতে তাহারা আনন্দ লাভ করিত। স্বাধীন ভাবে কথা বলিবার সুযোগ হইতে বাল্যকালেও

তিনি পুত্রদিগকে কোনদিন বঞ্চিত করেন নাই। প্রফুল্লচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন—পিতার ভৌগোলিক জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার জন্য আমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—সিবাস্টোপল কোথায়।—শিশু মনের বল্গাশূন্য হাস্যাস্পদ কৌতূহল। পিতা-পুত্রের মাঝখানে অকৃত্রিম মাধুর্য্যের বিদ্যমানতাই পুত্রকে এইভাবে কৌতূহলী করিতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শৈশবের শিক্ষা

প্রকৃতি মানবের শ্রেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী। শিশুর ছয়মাস বয়স হইতেই এই শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়। শিশুর বুভুক্ষু অন্তর জাগ্রত ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথে শব্দস্পর্শরূপময় প্রাকৃতিক বস্তু নিচয় যেন লুটিয়া লইতে থাকে। সহজ আনন্দের মধ্য দিয়া প্রকৃতির সহিত শিশুমনের যে সংযোগ স্থাপিত হয়, তাহাই শিশুর অন্তরশায়ী ভবিষ্যৎ মানুষের অঙ্কুরটিকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে। বেত্রাহত শিশুর অনিচ্ছুক মনের উপর চাপাইয়া দেওয়া মানুষের নীরস শিক্ষা-ব্যবস্থার কঠোরতা তাহার মনের অবাধ বিকাশের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং তাহার আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে মানুষ যাহা শিক্ষা করে, তাহা কখনই প্রকৃতিদত্ত শিক্ষার ন্যায় তাহার জীবনের সহিত একাঙ্গ হইয়া উঠে না। সুতরাং আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশটিরই আলোচনা করিব।

প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মস্থান রাড়ুলি কপোতাক্ষী নদীতীরে অবস্থিত। মাইকেলের অমর লেখনী মুখে এই কপোতাক্ষী নদী অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আজ এই নদী ক্ষীণকায়া। ইহার উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উপর দিকে ইহার অর্দ্ধাংশের বহতা একেবারে নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। ফলে ইহার তীরবর্ত্তী অঞ্চল সমূহের দিনদিনই অবনতি ঘটিতেছে। কিন্তু একদিন এই নদীতীরবর্ত্তী অঞ্চল সমূহ সভ্যতার একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এমন একদিন ছিল, যখন এই নদীধৌত অঞ্চল সমূহ ধনে, জনে, সমৃদ্ধিতে, শিক্ষায় এবং সভ্যতায় বাংলাদেশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই নদীর লহরী লীলায় সেদিন বুঝি জীবনসঙ্গীতের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সাগরদাঁড়ীর বালক মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদাত্ত গম্ভীর অনুরণন একদিন বুঝি এই নদীর বুকেই শুনিতে পাইয়াছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁহার মাহাত্ম্যের বীজ বুঝি এই নদীতীরেই কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। এই নদীতীরস্থ অঞ্চলসমূহে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের কর্ম্মশক্তি জীবনের সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং যাঁহাদের জীবন জাতীয় উত্তরাধিকারের মহান্ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু মহত্ত্বের আদর্শে ও চরিত্র গৌরবে তাঁহারা মানব জাতির পূজা পাইবার যোগ্য এবং তাঁহাদের জীবন সকল মানুষের অনুকরণীয়।

রাড়ুলির প্রাকৃতিক পরিবেশও অতি মনোরম। রাড়ুলির প্রান্ত দিয়া বহিয়া বহিয়া কপোতাক্ষী নদী দৃষ্টির বাহিরে কোথায় যেন মিলাইয়া গিয়াছে। তারই তীরে তীরে 'হরগোজার' অসংখ্য গাছ ফুলে ফুলে নদীতীর যেন আলো করিয়া রাখে। এখানকার নীলোজ্জ্বল আকাশ—মহাপুরুষের বিরাট্ অন্তরের সহিতই বুঝিবা উপমেয়—দৃষ্টির বাহিরে কুয়াশায় কোথায় যেন।তার সীমা হারাইয়া গিয়াছে। বর্ষায় নিবিড় কালো মেঘ আসিয়া এই আকাশের বুক আঁধার করিয়া ফেলে; কখনও বা আলো মেঘের খেলায় আকাশের গায়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া

উঠে। গ্রীষ্মের রৌদ্রদীর্ণ ধূসর প্রান্তর—বর্ষায় তারই বুকে ধানগাছের মাথায় মাথায় সবুজের সমারোহ লাগিয়া যায়, শীতে লক্ষ্মী যেন নিজের হাতে তাহার উপর সোনা বিছাইয়া দেন। আর বর্ষার নদী? বর্ষায় নদীর জল ফাঁপিয়া উঠে; উদ্দাম জলস্রোত ফুলিয়া রুষিয়া পথঘাট ভাঙ্গিয়া, খাল বিল ভাসাইয়া অশ্রান্ত গতিতে বহিয়া চলে; তার অশ্রান্ত কল্লোলে জীবনেরই গান বুঝি উদ্গীত হইতে থাকে—তার উদ্দাম গতিবেগ—সংগ্রামশীল হার-না-মানা দুর্বার জীবনগতিরই ইঙ্গিত বুঝি তাহাতে! রাড়ুলির এই বিচিত্র পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রাড়ুলির এই বিচিত্র পল্লীপ্রকৃতির মধ্যেই প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয়। রাড়ুলির এই পল্লী-প্রকৃতির মধ্যেই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জীবনের প্রথম নয়টি বৎসর অতিবাহিত করেন। মহাকালের বুকে বর্ত্তমানের পদচিহ্ন আঁকিয়া দিনের পর দিন আসিয়াছে, দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে—শিশু প্রফুল্লচন্দ্রও দিনে দিনে বড় হইয়া উঠিয়াছেন। মহাকালের বুকে সবই মুছিয়া যায়, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের এই নয়টি বৎসরও কি মুছিয়া গিয়াছে? এই কালজয়ী অমর মহাপুরুষের জীবনটিকে সমগ্রভাবে দেখিলে তাহা তো মনে হয় না। তাঁহার জীবনের দিক হইতে বিচার করিলে এই নয়টি বৎসরই অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় আমাদের মনের উপর ভাসিয়া উঠে। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে যে লোকোত্তর মানবতার অপূর্ব্ব প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতি এই নয় বৎসর ধরিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে তাহারই সম্ভাবনা রচনা করিতেছিলেন। শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধময় বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসম্ভারে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া দিয়া প্রকৃতি বুঝি পরবর্ত্তীকালের মহামানবতার উপযোগী করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

আমরা কল্পনার চোখে যেন দেখিতে পাই—পাখীর কলরব মুখরিত পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ পথে, নদীর বুকে, প্রান্তরে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদের মাঝখানে এই ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের শিশু হৃদয় উচ্ছ্বসিত আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে দোলা খাইয়া উঠিতেছে; আর সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য দিনের পর দিন সহজ আনন্দে তাঁহার হৃদয়ে আহৃত হইয়া চলিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নক্ষত্র, নদী, প্রান্তর—প্রকৃতির এই সমস্ত রহস্য-লোক বালক প্রফুল্লচন্দ্রের অস্পষ্ট মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা আমাদের জানা নাই। সাত বৎসর বয়সে আপেলের অধঃপতন নিউটনের মনে জিজ্ঞাসার যে বিরাট্ আবেগ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে দিনের পর দিন জ্যামিতিক প্রগতিতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছিল প্রজ্ঞালোকের দিকে। তেমন কোন বিরাট্ আলোড়নে প্রফুল্লচন্দ্রের চিত্ত আন্দোলিত হয় নাই। বাংলার ঘরের আর দশটি ছেলের মতই তিনি একজন ছিলেন। নয় বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রশ্ন তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, তাহা এবং পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত তাহার সুচিন্তিত উত্তর—স্যার উইলিয়ম জোন্সের মত তাঁহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল কিনা—তাহাও আমরা জানি না। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী কালের পরিণত মনের গঠন দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, পৃথিবীর চিরন্তন 'কেন' বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনের উপর ক্রিয়া করিতেছিল। পৃথিবীর দৃশ্যাবলী ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় তাঁহার বালক মনের কুয়াশার উপর ফুটিয়া উঠিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের চিত্তকে বিস্ময়ে কৌতূহলে ভরিয়া দিত। এই জাগ্রত কৌতূহল দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের অন্তর্লোকে পরবর্ত্তী কালের বৈজ্ঞানিকটিকে পরম যত্নে গড়িয়া তুলিতেছিল।

বস্তুতঃ প্রতিভাবান্ জ্ঞানী এবং মনীষী ব্যক্তিদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, একটি লোকাতীত আনন্দের আকর্ষণ তাঁহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধের মত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া সবলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে জ্ঞানলোকের দিকে। দৃঢ় অধ্যবসায়, সুদৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রম উন্নতি লাভের উপায়—আমরা মৌখিক উপদেশ দ্বারা ও আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া এই নীতি-বাক্য সর্ব্বদাই বালকদের শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি। অনেকের মতে প্রতিভার নিরানব্বুই ভাগই পরিশ্রম। কিন্তু অধ্যবসায়, সংকল্প বা পরিশ্রমের মধ্যে যে আয়াস স্বীকার বা আত্মনিগ্রহের ইঙ্গিত রহিয়াছে, প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের জীবনে সেই আত্মনিগ্রহের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের জ্ঞানসাধনার চলিবার পথে পরিশ্রম, সংকল্প, অধ্যবসায়—এই সমস্ত গুণগুলি অন্তরের আবেগ হইতে সহজ আনন্দে ফুলের মতই ফুটিয়া উঠে। নীতি শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া তাঁহারা কেহ অধ্যবসায়ী বা পরিশ্রমী হন নাই। আনন্দের তাগিদেই তাঁহারা অধ্যবসায়ী বা পরিশ্রমী হইয়াছিলেন। জ্ঞান সম্পর্কে মনের এই রসানুভূতিই তাঁহাদের উন্নতির মূলে সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ঐ একই সত্যে উপনীত হইব। জানার কৌতূহল—জ্ঞান লাভের আগ্রহ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনের মূলে রস সঞ্চার করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র শিক্ষিত, প্রতিভাবান, মার্জ্জিতরুচি এবং সংস্কৃতিবান্ লোক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল ও পরিপোষক একটি গ্রন্থাগার তিনি নিজের বাসগৃহেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সংবাদ ও অন্যান্য বহুতথ্যপূর্ণ বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্র তাঁহার এই গ্রন্থাগারের

সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিত। এই জ্ঞান-লাভের অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে বালক প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা দেখিতে পাই। পুত্রের জীবন গঠনে বুদ্ধিমান পিতার আগ্রহ এবং পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় প্রফুল্ল-চন্দ্রের জ্ঞানক্ষুধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার 'আত্মচরিতে' এক স্থানে বলিয়াছেন—"বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলিয়া আমরা অনেক বেশী শিখিতাম। তাঁহার নিকটে যাইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে ও গল্পাদি করিতে তিনি আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিতেন!" পিতার সাহচর্য্যে নয় বৎসর বয়সেই প্রফুল্লচন্দ্রের ভূগোল ও ইতিহাসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এই বয়সেই তিনি পিতার মুখ হইতে 'ইয়ং' এর "নাইট থটস্" (Young's Night Thoughts) এবং 'বেকনের' 'নভাম্ অরগানাম্' (Bacon's Novum Organum)—এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই দুইখানির নাম প্রথম শুনিয়াছিলেন। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—আমার মন কৌতূহল-প্রবণ ছিল। পড়াশুনাতেও আমার অনুরাগ ছিল।

বুঝিতে না পারিলেও পিতার গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি তিনি নাড়াচাড়া করিতেন। এই "নাড়াচাড়া" করার পিছনে যে মন ক্রিয়াশীল ছিল, তাহার সম্পর্কে খুব সুস্পষ্ট না হইলেও, মোটামুটি একটা ধারণা আমরা গড়িয়া লইতে পারি। তাঁহার পিতার দ্বারা কোন পুস্তক সন্নিবিষ্ট কোন ঘটনার উল্লেখ সেই পুস্তক সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রের মনকে কৌতূহলী করিয়া তুলিত। অক্ষরের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভাবগুলির সহিত পরিচিত হইবার অপার কৌতূহল লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র পুস্তকের পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। শ্রেণীবদ্ধ অক্ষরগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া জানিবার আগ্রহ তাঁহার তীব্রতর

হইয়া উঠিত। শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া মনে মনে পুস্তকের বাক্যগুলি গড়িয়া তুলিতেন এবং তাঁহার বাল্যের অপরিপুষ্ট মনের সাহায্যে ঐ বাক্যের একটি অর্থও বোধ হয় গড়িয়া তুলিতে চাহিতেন। বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিকদের লেখার সংকলন হইতে রুচিসম্মত অংশগুলি তিনি মুখস্থ করিতেন। এই বালক বয়সেই তাঁহার জ্ঞানাভিলাষ যে কিরূপ তীব্র হইয়াছিল, তাঁহার নিজের লেখা হইতেই আমরা তাহা জানিতে পারি। Ignorance is the curse of God, Knowledge the wing wherewith we fly to heaven. (অজ্ঞতা ভগবানের অভিশাপ, জ্ঞানের ডানায় ভর করিয়া আমরা স্বর্গে উপনীত হই)।—সেক্‌স্‌পিয়ারের এই উক্তির সহজ মাধুর্য্য ও সততা তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি এই অংশটুকু একদিন মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে,—এই মুখস্থ করার পিছনে কোন দুর্দ্দান্ত শিক্ষকের রক্তচক্ষু বা বেত্রভীতি মোটেই ক্রিয়াশীল ছিল না। মনের সহজ আনন্দে চালিত হইয়াই তিনি ইহা করিয়াছিলেন। যে বালক এই চাঞ্চল্যসুলভ বাল্যেই জ্ঞানকে এত ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন, তিনি যে উত্তর কালে জ্ঞানেরই একনিষ্ঠ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিয়া লইতে পারি।

এই বাল্যকালেই প্রফুল্লচন্দ্রের সেক্‌স্‌পিয়ারের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—বাল্যকালে তিনি যেটুকু পড়িয়াছিলেন, তাহার ফলেই অমর কবির নাটকের প্রতি—বিশেষতঃ বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

সুতরাং আমরা দেখিলাম কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই

প্রফুল্লচন্দ্রের মনের একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রবণতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই প্রবণতা জ্ঞানাভিমুখী। বয়সের অনুপাতে তাঁহার মনের বৃদ্ধি একটু বেশীই হইয়াছিল। তাঁহার দ্রুতবর্দ্ধনশীল মন পাঠ্য-তালিকা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের আবৃত্তি মুখরতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে কোনদিনই আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। মুক্তপক্ষ শিশুবিহঙ্গের মত তাঁহার অপরিপুষ্ট মনের ডানায় ভর করিয়া জ্ঞানলোকের বহুদূর পর্য্যন্ত তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দে বিচরণ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানের বাঁধাধরা বিচরণ ক্ষেত্র ছিল তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়। এখানে তিনি ও তাঁহার অপর তিন সহোদর অধ্যয়ন করিতেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি অনন্য-সাধারণ মেধা বা অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই। দিয়া থাকিলেও, তৎসম্পর্কে কোন বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নাই। দেশের আর দশ জন বালকের মত তিনিও একজন ছাত্র ছিলেন। ধারণা শক্তি বা স্মৃতি শক্তির দিক হইতে অপর সকলের অপেক্ষা তাঁহার হয়তো একটু বিশিষ্টতা ছিল। কিন্তু বৃহত্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার মত কোন বিশেষত্ব তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে বিশেষত্ব তাঁহার ছিল, তাহা শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে বা প্রশ্ন-পত্রের সমাধানে সর্ব্বদা ধরা পড়ে না। জ্ঞান সম্পর্কে অন্তরের একটা সহানুভূতিই ছিল সেই বিশেষত্ব; এবং ইহাই দিনের পর দিন ভাবীকালের সাধনার উপযোগী করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক চিত্তকে গড়িয়া তুলিতেছিল।

কলিকাতায় আগমন ও উচ্চ শিক্ষা

প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যকালের প্রবণতা অনুকূল পরিবেশের মধ্যে গতিবেগ লাভ করিয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে অতন্দ্র সাধনার পথে আগাইয়া দিয়াছিল, কেমন করিয়া ধনীর সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র উত্তরকালে বিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মার মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিয়া জনকল্যাণে ও সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্রের জীবনে একটি সমস্যা দেখা দিল। ঐ বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় পাশ করেন। তাঁহার মধ্যম ও তৃতীয় পুত্র নলিনীকান্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র সেই বৎসরই ঐ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার এই পুত্রদের লইয়া কি করিবেন—ইহাই তাঁহার প্রধান সমস্যা হইল। পুত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। তৎকালে কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোথাও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। অথচ এই সুকুমার বয়সে তাঁহার বালক সন্তানদিগকে কলিকাতায় কাহার তত্ত্বাবধানে রাখিবেন? পুত্রদের লইয়া নিজে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারিলে, পুত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন।

কিন্তু সে দিকেও তাঁহার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। রাড়ুলি গ্রাম লইয়া তাহার চারিপাশে কয়েকখানি গ্রামে তাঁহার জমিদারী বিস্তৃত ছিল। তাহা ছাড়া, বন্ধকী কারবারে তিনি দেশের মধ্যে বহু টাকা দাদন দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—বৈষয়িক কার্য্য নিজে পরিদর্শন না করিলে বিষয়ের বনিয়াদ শিথিল হইয়া পড়ে। তখনকার দিনে

রাড়ুলি হইতে কলিকাতায় যাইতে নৌকাপথে ৩।৪ দিন লাগিত। সুতরাং প্রায়শঃ বাড়ী যাইয়া যে বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করিবেন—সে সম্ভাবনাও তখন ছিল না। অতএব, বৈষয়িক অবস্থার দিক হইতে বিচার করিলে স্বগ্রাম হইতে দূরে যাইয়া বাস করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু পুত্র সম্পর্কে পিতার কর্ত্তব্য-বোধই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে হরিশ্চন্দ্র পুত্রদিগকে লইয়া সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিলেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

নয় বৎসর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। পল্লীর সহিত সহরের কি বিরাট পার্থক্য! কলিকাতায় আসিবার সাথে সাথে তাঁহার চোখের সম্মুখে যেন এক সম্পুর্ণ নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া গেল! উদ্দাম গতিশীলতায় ও কর্ম্মচাঞ্চল্যের মুখরতায় এখানে জীবন একেবারে উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে! বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বহুমুখী জীবনের ধারা বিচিত্র ভঙ্গীতে বহিয়া চলে এখানে; পৃথিবীর সকল দেশের নর নারী তাহাদের বিচিত্র পরিচ্ছদ ও অভিনব আচার ব্যবহার লইয়া মনের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতে থাকে। এর সুবৃহৎ সৌধমালা, বিরাট শিক্ষায়তন, বড় বড় সওদাগরী অফিস—এর রেলগাড়ী, জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের কল্যাণকর ফলসমূহ—এই সব লইয়া সহরের জগৎ গ্রাম্য জগৎ হইতে এত স্বতন্ত্র যে কলিকাতাকে প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট একটি অভিনব জগৎ বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

হরিশ্চন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্রকে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কলিকাতায় তখন হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুল—এই দুইটি বিদ্যায়তন অন্য সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিল। এই দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধ্যাপনার উৎকর্ষ সম্পর্কে একটি প্রতিযোগিতার ভাব বিদ্যমান ছিল। বিশেষতঃ, মহামতি হেয়ার সাহেবের নামের সহিত বিজড়িত থাকায় হেয়ার স্কুলের সুনাম বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্র তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-মন্দিরেই প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭০ সাল হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার মনে যে বিতৃষ্ণার ভাব আমরা লক্ষ্য করি, হেয়ার স্কুলেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ এখানকার শিক্ষা আদৌ তাঁহার তৃপ্তিদায়ক হয় নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, পাঠ্যতালিকা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পড়িয়া তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা কোনদিনই পরিতৃপ্ত হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় অতন্দ্র পরিশ্রমে জ্ঞান আহরণে যত্নপর হইলেন। এই তরুণ বয়স্ক বালক জ্ঞানের উপর সহজ অনুরাগ বশতঃই পুস্তকের পর পুস্তক পড়িয়া চলিলেন। তাঁহার অধ্যয়নের মূল বিষয়-বস্তু সাহিত্য হইলেও, বিভিন্ন গ্রন্থ তাঁহার পাঠ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জীবন-চরিত, ইতিহাস, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কীয় বহু গ্রন্থ এই সময় হইতেই তিনি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।

ইতিহাস ও জীবন-চরিতের উপর তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। 'চেম্বার' সম্পাদিত 'জীবন-চরিত' এবং 'নিউটন' ও 'গ্যালিলিওর' জীবনী

এই সময় তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মচরিত তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, পরিণত বয়সেও এই ইয়াঙ্কী মনীষীর জীবনী হইতে তিনি আনন্দ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন। 'স্যার উইলিয়ম জোন্সের' জীবনীও তাঁহার প্রিয় ছিল। "পড়িলেই সব জানিতে পারিবে"—তাঁহার মায়ের এই বিখ্যাত উপদেশ-বাণী প্রফুল্লচন্দ্রকে সর্ব্বদাই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই বয়সেই 'জোন্স্' ও 'জন লেভেনের' ভাষাতত্ব সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইবার মত মানসিক উৎকর্ষ প্রফুল্লচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭৪ সালের আগষ্ট মাসে গুরুতর রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্র স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এই রোগ হইতে তিনি কোন দিনই সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। জীর্ণ ব্যাধি রূপে ইহা সারা জীবন তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছে; এবং ইহার ফলস্বরূপ অজীর্ণ, উদরাময় ও অনিদ্রা রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আহারাদি সম্পর্কে কঠোর নিয়ম পালন, নিয়মিত ব্যায়াম ও ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার ভগ্ন দেহকেও তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু ও কর্ম্মপটু রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই ব্যাধিকে প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু কতকটা ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব কোনদিনই অনুকূল ছিল না। নানাস্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন বালকের দ্বারা শ্রেণীগুলি গঠিত; ব্যক্তিগত বুদ্ধির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ সেখানে হয় না। বয়স অনুপাতে বুদ্ধির আনুমানিক গড় ধরিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার মান নির্ণয় করা হয়। ফলে, যাহার বুদ্ধি সেই মানের উপরের বা নিম্নের স্তরের, তাহাদের

শিক্ষার অবহেলাই হইয়া থাকে। উপরন্তু, বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ায় শিক্ষার উন্নতি কাহারও পক্ষে আশানুরূপ হয় না। বিলাতের বিদ্যালয়ে চরিত্র গঠনের যে অনুকূল আবহাওয়া বিদ্যমান, দেশীয় বিদ্যালয়ে তাহার একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার মধ্যে যাহাদের পড়াশুনা আবদ্ধ, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও বহুমুখিতা যতই হউক না কেন, তাহাদের পড়াশুনা ধীর গতিতেই হইয়া থাকে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব তাহাদের মধ্যে অল্প লোকের জন্যই বিশেষ যশ আহরণ করিতে পারিয়াছে।

রোগগ্রস্ত হইয়া বাড়ী বসিয়া থাকায়, তাঁহার এই সুবিধা হইল যে, বিদ্যালয়ের যে সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তিকে শৃঙ্খলিত ও অবরুদ্ধ রাখিতে হইত, তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইলেন ; এবং বিদ্যালয় তাঁহার স্বাধীন জ্ঞানান্বেষণ পথে যে অন্তরায় সৃষ্টি করিত, তাহা তাঁহার পথ হইতে অপসারিত হইল। অমনোযোগী ছাত্রের পক্ষে যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা তাহার উন্নতির কারণ হইত, জ্ঞানের উপর সহজ অনুরাগ-বশতঃ এই বালকের পক্ষে তাহার প্রয়োজন ঠিক ততখানি ছিল না। তাঁহার এই বিদ্যালয়ের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবন যথেচ্ছ জ্ঞান আহরণ দ্বারা অল্প বয়সে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

এই সময়ে 'স্মিথের' 'প্রিনসিপিয়া ল্যাটিনা' নামক ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার একখানি প্রাথমিক গ্রন্থ প্রফুল্লচন্দ্রের হস্তগত হয়। এই পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং নিজের চেষ্টায় উক্ত পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ল্যাটিন ভাষার ব্যাকরণ পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলেন। তিনি এই ভাবে 'ফ্রেঞ্চ প্রিনসিপিয়া'র প্রথম ও

দ্বিতীয় ভাগ নিজের চেষ্টায় পাঠ করেন, পরে আবার তিনি কখন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, এই পূর্ব্বাহৃত জ্ঞান তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক হইয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—“যত সাহিত্যের সহিত পরিচিত হই না কেন, ইংরাজী সাহিত্য আমাকে যাদু করিয়াছিল।” কে. এম্. ব্যানার্জ্জী সংকলিত Encyclopaedia Bengalensis নামক পুস্তকখানি প্রফুল্লচন্দ্রের পিতার গ্রন্থাগারে ছিল। ‘আরনল্ডের’ ‘Lectures on Roman History’ ‘রলিন্সের’ ‘Ancient History’ ‘গিবন্‌সের’ ‘Roman Empire’ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে নির্ব্বাচিত অংশগুলি ঐ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। উক্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র ঐ সকল বিখ্যাত লেখকদিগের উন্নত শ্রেণীর ভাষার রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। ‘চেম্বার’ সংকলিত ‘Biography’ এবং ‘মণ্ডারের’ ‘Treasury of Biography’ অধ্যয়নের ফলে অল্প বয়সেই প্রফুল্লচন্দ্র উন্নততর ও মহত্তর জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। জীবন চরিত ও ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্বলিত এই সকল পুস্তক অধ্যয়নের ফলে তাঁহার স্মৃতি ঐতিহাসিক তথ্য-সম্ভারে পূর্ণ হইয়াছিল। ‘গোল্ডস্মিথের’ ‘Vicar of Wakefield’ নামক বিখ্যাত পুস্তকখানি তিনি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার অপূর্ব্ব রসাল ভাষা তাঁহার কিশোর মনটিকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিল। ‘এডিসনের’ ‘স্পেক্‌টেটর’ ও ‘জন্‌সনের’ ‘রাসেলাস’ প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থের সহিত তিনি এই সময়েই পরিচিত হইয়াছিলেন। ‘নাইটের’ ‘Half-hour with the best authors’ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ‘Julius Caesar’, Merchant of Venice ও Hamlet এর কতকগুলি

নির্ব্বাচিত অংশ অধ্যয়ন করিয়া অমর কবি 'সেক্‌স্‌পিয়ারের' গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণভাবে পড়িবার জন্য তাঁহার কিশোর মনে গভীর আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

দুই বৎসর রোগভোগের পর রোগের তীব্রতা মন্দীভূত হইলে, প্রফুল্লচন্দ্র পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। স্কুলের সেসন্ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সেসনের অবশিষ্ট কয়েক মাসের জন্য আলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই শিক্ষায়তন 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের' প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত হইত।

প্রফুল্লচন্দ্র যে আলবার্ট স্কুলের উপর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হইতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তদানীন্তন সামাজিক কুসংস্কার হইতে মুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মন সংস্কার-প্রয়াসী ছিল। এই পিতার সাহচর্য্যে মানুষ হওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্রের মনও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে আড়ষ্ট শ্রদ্ধার ভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সংস্কারপন্থী মনীষীদিগের নূতন ভাবধারার সহিত গ্রামে থাকিতেই তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা তিনি নিয়মিত অধ্যয়ন করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি চিন্তানায়কদিগের রচনা ও উপদেশ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে মিশিবার এবং ধর্ম্ম সম্পর্কে সংস্কারপ্রয়াসী চিন্তানায়কদিগের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ

করেন। 'ষ্ট্রস্' প্রণীত 'Life of Christ the Man' ও 'রেনানের' Life of Jesus প্রভৃতি গ্রন্থে অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় ঘটনা বর্জ্জিত যীশু খৃষ্টের জীবনের আলোচনা করা হইয়াছে। যুক্তিবাদ-মূলক ধর্ম্মের সমর্থনে এই সমস্ত গ্রন্থ লিখিত। প্রফুল্লচন্দ্র এই সকল পুস্তক অধ্যয়ন করেন। এইভাবে কৈশোরেই ধর্ম্মের অপৌরুষেয়তা সম্পর্কে তিনি আস্থাহীন হইয়া পড়েন। বোধ ও প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মই মানুষের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম—এই বিশ্বাস তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। উত্তর কালে অন্যান্য গ্রন্থপাঠে ও স্বাধীন চিন্তার ফলে তাঁহার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। এই সমস্ত ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার ফলে জাতিভেদ, বাধ্যতা-মূলক বৈধব্য, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথাগুলিকে তিনি অত্যন্ত জঘন্য আচার বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করেন।

স্বভাবতঃই যাঁহারা এই সমস্ত সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, এবং এই সমস্ত সংস্কারমূলক চিন্তাপোষণ করিবার জন্য পিতৃপরিত্যক্ত, সমাজ-পরিত্যক্ত হইয়া মস্তকে অশেষ নির্য্যাতনের কণ্টক-মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে তাঁহাদের অভিমুখে প্রধাবিত হইবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি?

কেশবচন্দ্র সেন জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন এবং ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বহু শিক্ষিত যুবক তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা প্রফুল্ল-চন্দ্রকেও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আমি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে যাইতাম।.........টাউনহলে কিম্বা ময়দানে বা আলবার্ট হলে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ আমি কখনই ত্যাগ করিতাম না।”

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে যিনি এরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তিনি স্বভাবতঃই তাঁহার পরিচালিত বিদ্যায়তনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখানে অধ্যয়ন কালে বিদ্যালয়ের পাঠ আর তাঁহার পক্ষে নীরস বা শুষ্ক ছিল না। হেয়ার স্কুলে পড়িবার কালে তাঁহাদের শ্রেণীর যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার বিরাট দেহ, ঘন গুম্ফ ও ভীতি জনক মুখাকৃতি ছাত্রদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত। সুতরাং ছাত্রদের সঙ্কুচিত মন সহজ আনন্দে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইত না। কিন্তু আলবার্ট স্কুলের এই সমস্ত সমাজ-পরিত্যক্ত শিক্ষক শান্ত প্রকৃতি ও চরিত্রের মাধুর্য্য দ্বারা ছাত্রদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেন এবং ছাত্রগণ শিক্ষামন্দিরের বাহিরেও শিক্ষকের মহৎ ও মধুর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিত।

প্রফুল্লচন্দ্র স্বীয় ‘আত্মচরিতে’ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রনাথ দাঁ—আলবার্ট স্কুলের এই দুইজন শিক্ষকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জীবনের আদর্শের জন্য সামাজিক নির্য্যাতন তাঁহারা হাসিমুখে বরণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার সহাধ্যায়ীরা প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন এবং সকল বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ করিতেন। তাঁহারা এই সকল ছাত্রের নিকট ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করিতেন এবং প্রজ্ঞা ও বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেসনের অবশিষ্ট কয়েক মাস আলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সহপাঠিদের অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের উৎকর্ষ সকলে উপলব্ধি করিলেন এবং বয়সের অনুপাতে তাঁহার অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্রের কথা শীঘ্রই শিক্ষকদিগের আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। এখানে অধ্যয়ন কালে তাঁহার রোগের সময় অধীত বিদ্যা বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। ক্লাসে যখনই শব্দরূপ সম্পর্কীয় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ল্যাটিন ভাষার জ্ঞানের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় একই শব্দের বিভিন্ন রূপ এবং তাহার ধাতুগত অর্থ বলিয়া দিতেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেসনের শেষে বার্ষিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত হইলেন। পরীক্ষা দিলে তিনি সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন—এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। কিন্তু সেসনের অন্তে পুনরায় হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হইবার আশা প্রফুল্লচন্দ্র পোষণ করিতেছিলেন। আলবার্ট স্কুলে পরীক্ষায় প্রথম হইয়া পুরস্কার লাভ করিয়া পরে অন্য বিদ্যালয়ে চলিয়া যাওয়া তিনি অন্যায় মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পরীক্ষা দিতে বিরত থাকেন। পরীক্ষা না দিলেও পুরস্কার বিতরণের সময় শিক্ষকেরা সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে একটি বিশেষ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র আলবার্ট স্কুলে থাকিয়া যাইতে বাধ্য হন। একে শিক্ষকদের চরিত্র মাধুর্য্যে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার উপর কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ শিক্ষকদের নির্ব্বন্ধাতিশয্য এড়াইয়া হেয়ার স্কুলে পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র

তাঁহার 'আত্মচরিতে' আলবার্ট স্কুলে তাঁহার স্থিতিকে জীবনের একটি শুভঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আলবার্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী সেন। ইনি কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা। ইঁহার ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কেশবচন্দ্র সেন বগ্মিতায় যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, কৃষ্ণ বিহারী সেনও সেইরূপ ইংরাজীতে লেখনী চালনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-পদ্ধতি সহজেই ছাত্রদিগের মন আকর্ষণ করিত।

মূল বিষয় মধ্যে আলোচনা আবদ্ধ না রাখিয়া আনুসঙ্গিক বহুতথ্যের অবতারণা দ্বারা তিনি ছাত্রদিগের মনে কৌতূহল, ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিতেন। এই জন্য তাঁহার অধ্যাপনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত। ফলতঃ, কৃষ্ণবিহারীর শিক্ষকতা গুণে ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই বিদ্যালয় হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি শিক্ষকদিগের আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তিনি বৃত্তি লাভ করেন নাই। এই পরীক্ষার ফল প্রফুল্লচন্দ্র যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে জীবনের মূল লক্ষ্য জ্ঞান আহরণ, সাধনা যেখানে আত্ম প্রত্যয় ও অধ্যবসায়ের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কৃতিত্বের লৌকিক পরিচয়-পত্র যে রূপই হউক না কেন, তাহাতে শিক্ষার্থীর মানসিক স্থৈর্য্য এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় না। জ্ঞানলাভের বিভিন্ন স্তরে, শিক্ষার ছাড়পত্র চাকরির মোহগ্রস্ত বাঙ্গালী যুবকের নিকট

যতই কাম্য হউক না কেন, জীবনের সফলতার পক্ষে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে—এ সত্য প্রফুল্লচন্দ্র বুঝি সেই কিশোর বয়সেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সাহিত্যের উপরই তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ভাগ্যদেবী যদি কোন দিন তাঁহার মাথায় সফলতার মুকুট পরাইতে আসেন, সাহিত্যের পথ বাহিয়াই তিনি আসিবেন—স্বতঃই যেন এই কথা মনে আসিতে থাকে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তাঁহার সাধনার গতি অপ্রত্যাশিতভাবে ভিন্ন দিকে নিয়ন্ত্রিত হইল। সাহিত্য তাঁহার অবসর বিনোদনের সহচরী থাকিলেও, বিজ্ঞানই তাঁহার অভীষ্ট দেবীরূপে দেখা দিলেন।

কিরূপে যে তাঁহার মন বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমাদিগকে কতকটা হতাশ হইতে হয়। তাঁহার জীবনের পূর্ব্বেকার কোন ঘটনা দ্বারা বিজ্ঞানের উপর তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ সূচিত হয় না। নিউটন ও গ্যালিলিওর জীবন-চরিত তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের জীবন চরিত অধ্যয়নেও তাঁহার সমান আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি নিশ্চিতই তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু সাহিত্য তো তাঁহাকে একেবারে 'যাদু' করিয়াছিল। বাঙ্গালী অনুভূতি-প্রধান জাতি। তাহার মনে ভাবের নীহারিকাপুঞ্জ আনন্দের উত্তাপে স্পন্দিত হইতে থাকে, তাহার অনুভূতিতে সত্যের বিচিত্র রূপ লইয়া তাহারা ফুটিয়া উঠে। এ অনুভূতি দ্রষ্টার—কবির—সাহিত্যিকের। বাংলার তুলসীমঞ্চ নারায়ণের

আবাসভূমি, বাংলার কীর্ত্তনে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনের নিত্য লীলায় আবির্ভূত হন, বাংলার ভাবগানে কোন্ অচিনপুরুষের আবাহন ধ্বনিয়া উঠে, বাংলার উদ্যানে প্রান্তরে কোন্ কুহকীর শ্যামচ্ছায়ার মায়ারচনার মধ্যে দেবতার স্নিগ্ধ দৃষ্টি উঁকি দিতে থাকে, বাংলার মাটি দ্রষ্টার—কবির—সাহিত্যিকের। এখানে বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইবে, কে কবে ভাবিয়াছিল। তবে যুক্তিবাদ ও পরীক্ষণের (Rationalism ও Experiment) ভিত্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠার যে দার্শনিক মতবাদ ইউরোপীয় সভ্যতায় যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল, তাহার হাওয়া পশ্চিম হইতে প্রাচ্যের বুকে আসিয়া লাগিয়াছিল এবং পরোক্ষে বাংলার মাটিকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল।

এনট্রান্স পাশ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে এফ. এ. ক্লাশে ভর্ত্তি হইলেন। এফ. এ.-নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র অবশ্য পাঠ্য ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইয়া বাহিরের ছাত্র হিসাবে রসায়ন শাস্ত্রের বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেন। পৃথিবীতে বড় হইবার জন্য যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, সকল ক্ষেত্রেই তাঁহাদের বিশেষত্ব সমান ভাবেই প্রকটিত হইয়া থাকে। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা দেখিয়াছি, রসায়নে দীক্ষিত হইবার পর বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা দেখিতে পাই। ক্লাশে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি তাঁহার এক সহাধ্যায়ীর বাড়ীতে একটি ছোটখাট পরীক্ষণাগার (লেবরেটারী) স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সময় ছেলেরা কলেজ-পাঠ্য পুস্তক লইয়াই বিব্রত থাকে, সেই সময়

কলেজ-পাঠ্য ছাড়াও রসায়ন শাস্ত্রের অনেকগুলি পুস্তক তিনি পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলেন। মনে হয়, রসায়ন শাস্ত্রের সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া ইহার অনন্ত রহস্যের মাধুর্য্যে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই সম্ভাবিত সাহিত্যিক প্রফুল্লচন্দ্র আকস্মিকভাবে বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ তপস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ছাত্রাবাসে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। প্রফুল্লচন্দ্রের এনট্রানস পাশ করিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পিতা হরিশ্চন্দ্রের জীবনে আর্থিক বিপর্য্যয় আরম্ভ হয়। তাঁহার জমিদারী একটির পর একটি বিক্রয় হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার আর্থিক অবস্থা এমন সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল যে, কলিকাতায় বাসা রাখিয়া পুত্রদের শিক্ষার সুব্যবস্থা বজায় রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

এফ. এ. পড়িবার সময় প্রফুল্লচন্দ্র গোপনে 'গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই পরীক্ষা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অনুরূপ ছিল। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বের অধীত ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা কাজে লাগিয়া গেল। কারণ ঐ দুই ভাষা উক্ত বৃত্তি পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্য ছিল। অন্য অপরিহার্য্য ভাষা ছিল গ্রীক অথবা সংস্কৃত। এফ. এ. পরীক্ষার জন্য তিনি রঘুবংশ ও ভট্টিকাব্যের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং জনৈক পণ্ডিতের সহায়তায় কুমারসম্ভবও পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভালভাবেই প্রফুল্লচন্দ্র এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কয়েক মাস সংশয় ও উদ্বেগের মধ্যে অতিবাহিত হইবার পর একদিন ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত পরীক্ষার ফল বাহির হইল। দেখা গেল, প্রফুল্লচন্দ্র ও বাহাদুরজী নামক জনৈক পার্শী যুবক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

'গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাত যাইবার সংকল্প করিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে পিতার সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। পুত্র সম্পর্কে উচ্চশিক্ষাভিলাষী হরিশ্চন্দ্র সহজেই সম্মত হইলেন। প্রফুল্লচন্দ্র মাতার মত চাহিয়া পত্র দিলেন। মাতাও তাঁহার প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। এখানে তাঁহার মাতার চরিত্র প্রণিধানযোগ্য। সন্তানকে অঞ্চলের নিধি করিয়া—'বাঙ্গালী' করিয়া রাখিবার মত অন্ধ স্নেহে তাঁহার অন্তর আচ্ছন্ন ছিল না। স্নেহকেও যে প্রয়োজন মত কতখানি .কঠোর হইতে হয়, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর মা হইয়াও এই সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। অবশ্য সন্তানকে বিদায় দেওয়ার সময় সম্ভাবিত বিচ্ছেদবিধুরা জননীর বাৎসল্য অশ্রুর মুক্তাবিন্দুতে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। মাতৃমনের এই মাধুর্য্যময় দুর্ব্বলতা—সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সন্তানকে বিদায় দিতে যে মানসিক শক্তি ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার প্রয়োজন—তাহাকে আরও প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলে।

বাল্যকাল হইতে এই দেশে শিক্ষার পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিলাম। মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠে জীবন সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও বিস্তৃত হইয়াছিল। অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা তাঁহার রুচি মার্জ্জিত ও জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছিল। সাহিত্য তাঁহার হৃদয়বৃত্তির উন্মেষসাধন করিয়া কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। ইতিহাস পাঠে তাঁহার স্মৃতি বহু তথ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। জীবন সম্পর্কে গভীর দায়িত্ববোধ ও আন্তর সম্পদের প্রাচুর্য্য বশতঃ যুবোচিত লঘু আনন্দের স্পৃহা এবং চটকদার বাহ্যিক পারিপাট্য সাপের খোলসের ন্যায় অপ্রয়োজনে তাঁহার জীবন

হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ একাধিক সন্তান কোলে পাইবার সৌভাগ্য যে বঙ্গজননীর একদিন হইয়াছিল, তিনি যে অন্য সকল প্রদেশের পুরোভাগে থাকিয়া ভারতবর্ষকে চালনা করিবেন—তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র—বিলাতে

১৮৮২ সালে কালিফোর্ণিয়া নামক জাহাজে প্রফুল্লচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইলে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও মিঃ এস. আর. দাস তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ইঁহারা উভয়েই তখন বিলাতে ছাত্র হিসাবে বাস করিতেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র এক সপ্তাহকাল লণ্ডনে অবস্থান করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত বৈদেশিক আবহাওয়ার মধ্যে মনে যে ভয় ও সঙ্কোচের ভাব জন্মে, এই এক সপ্তাহ মধ্যেই প্রফুল্লচন্দ্র তাহা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন।

লণ্ডন হইতে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরায় গমন করেন এবং সেখানকার অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ক্রাম ব্রাউনের ছাত্ররূপে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ক্রাম ব্রাউনের রসায়ন শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা রসায়ন শাস্ত্র বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সহকারীদ্বয়ও রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ কৃতবিদ্য এবং পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের সাহচর্য্যে ও উপদেশে প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়ন শাস্ত্রের উপর স্বাভাবিক অনুরাগ একনিষ্ঠ সাধনায় পরিণত হইয়াছিল। রসায়ন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য তিনি এই সময়ে জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বি. এস্-সি. পরীক্ষার জন্য পদার্থ বিদ্যা ও

প্রাণী বিদ্যা তাঁহার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাহারা রসায়ন শাস্ত্রের ন্যায় তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

১৮৮৫ সালে প্রফুল্লচন্দ্র যখন বি. এস-সি. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর। এই সময়ে এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয় 'সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের অবস্থা' সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করে। প্রফুল্লচন্দ্র যদিও ইতিহাস ও রাজনীতি চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি ভারত সন্তান হিসাবে এই আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

এই প্রবন্ধ রচনার জন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় রাজনীতি, অর্থনীতি এবং দেশের প্রচলিত শাসননীতি সম্পর্কে সুপ্রচুর জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারার সহিত পরিচিত না হইলে, স্বাধীন অথচ অভ্রান্ত মতবাদ গড়িয়া উঠে না। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্র এই প্রবন্ধ রচনার জন্য রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতার রিপোর্ট ও বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত ভারত সম্পর্কীয় প্রবন্ধাদিও তাঁহার অধীত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এইরূপে প্রফুল্লচন্দ্র অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বহু তথ্যপূর্ণ একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিলেন। যথাসময়ে প্রবন্ধ দাখিলও করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষকদিগের বিচারে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া

বিবেচিত হইল না। তাহার ও অন্য আর এক জনের প্রবন্ধ আদর্শের কাছাকাছি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। প্রবন্ধ পরীক্ষক প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধের উপর মন্তব্য করিয়ছিলেন—"ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইহা শ্লেষপূর্ণ আক্রমণে পূর্ণ।" অথচ এই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষিত সমাজ এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি লেখকের ভারত সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং স্বাধীন নির্ভীক মতবাদের জন্য ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি নিবেদনে লিখিত হইয়াছিল—"ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের অবহেলা ও ঔদাসিন্যের ফলেই ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উৎপত্তি। ইংলণ্ড এই পর্য্যন্ত ভারতের প্রতি তার পবিত্র কর্ত্তব্য পালন করে নাই। তোমরা গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের ভবিষ্যৎ বংশধর, ভারতে অধিকতর উদার, ন্যায়সঙ্গত ও সহৃদয় শাসন নীতি অবলম্বনের জন্য তোমাদের দিকেই আমরা চাহিয়া আছি। সেই শাসন নীতির উদ্দেশ্য কতকগুলি মামুলি বুলি হইবে না। তাহার উদ্দেশ্য হইবে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন। তোমাদেরই উপরে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা, শীঘ্রই এমন একদিন আসিবে যে, তোমাদিগকে সেই সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করা যাইবে, যে সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্ত যায় না—যাহার রাষ্ট্রীক বলিয়া আমরা গৌরবান্বিত। অদূর ভবিষ্যতে তোমরাই ২৫ কোটি মানবের ভাগ্যবিধাতা হইবে। আমরা আশা করি যে, তোমরা যখন রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পাইবে, তখন বর্ত্তমান অব্রিটিশ নীতির অবসান হইবে এবং ভারতে এখনকার চেয়ে উজ্জ্বল ও সুখময় যুগের উদয় হইবে"।

উক্ত পুস্তিকার একখণ্ড বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক 'জন্ ব্রাইটের' নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে যাহা লিখিয়াছিলেন, বাংলায় তাহার মর্ম্ম দেওয়া হইল :—

"আমি আপনারই মত 'লর্ড ডাফরিনের' বার্ম্মা-নীতির জন্য দুঃখিত এবং তাহার তীব্র নিন্দা করি। পুরাতন পাপ ও অপরাধের ইহা পুনরাবৃত্তি—সে নীতি চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম। ভারতে আমাদের প্রকৃত স্বার্থ কি ? তৎসম্বন্ধে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে গভীর অজ্ঞতা, সঙ্গে সঙ্গে ঘোর স্বার্থপরতাও রহিয়াছে। সত্যকার রাজনীতি ও নৈতিক আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ ও ধ্বংস অনিবার্য্য। আমাদের বংশধরগণের তাহা হয়তো প্রত্যক্ষ করিতে হইবে ; এবং তাহা দেখিয়া অনুতাপ করিতে হইবে।"

১৮৮৬ সালে লিখিত প্রফুল্লচন্দ্রের "ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ"-ও দেশবিদেশের সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উক্ত চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ এখানে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়া উদ্ধৃত করা হইল—

"দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ড এখন অপরিহার্য্য যুক্তি ও তথ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় এবং ভারতের নব-উদ্বোধিত জাতীয়তার ভাবকে সে পিষিয়া মারিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। বিদেশী শাসনের স্বার্থপর, কঠোর ও নিষ্ঠুর নীতির ফলে দেশবাসীর উপর নানাপ্রকার অযোগ্যতার ও অক্ষমতার ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে কোন ভারতবাসী নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্ত্তেই সে

সম্ভবতঃ নিজেদের জন্য লজ্জা অনুভব করে। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখে—ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কথা ও কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।”

প্রফুল্লচন্দ্রের এই সময়ে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে আমরা যেন তাঁহার জীবনের খাঁটি সুরটুকুর পরিচয় পাই। নির্ভীক সত্যবাদীতা, অনাবিল দৃষ্টি দিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস, দুর্ভাগা দেশমাতৃকার জন্য গভীর মমতা-বোধ—সকলই তাঁহার লেখনী-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখিয়া আমরা ভবিষ্যৎ প্রফুল্লচন্দ্রকে কতকটা যেন ধারণা করিয়া লইতে পারি।

১৮৮৭ সালে প্রফুল্লচন্দ্র ‘এডিনবরা’ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন। তিনি ঐ বৎসরই ‘হোপবৃত্তি’ পাইয়া আরও এক বৎসর তথায় অবস্থান করেন এবং জৈব রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়নে ও গবেষণা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

১৮৮৮ সালের প্রথমে প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরিবার সংকল্প করেন। কিন্তু দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে স্কটলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। ‘ওয়ার্ডসওয়ার্থ’, ‘স্কট’ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদিগের লেখনীতে ‘হাইল্যাণ্ডের’ এই সকল দৃশ্যাবলী অমর হইয়া আছে। তিনি তাঁহার এক মুসলমান বন্ধুর সহিত ইহার ঐতিহাসিক স্থানগুলি এবং সকল সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এই স্কটলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিয়া দেখিয়া সমস্ত স্কটলণ্ড পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতে ফিরিবার পূর্ব্বে তিনি ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে চাকরি পাইবার আশায় লণ্ডনে কয়েক মাস অপেক্ষা করেন। ব্রিটিশের বর্ণ-বৈষম্য মূলক নীতির ফলে অবশেষে তাঁহাকে হতাশ হইয়া দেশে ফিরিতে হয়। এবার তিনি

সরাসরি জাহাজে না আসিয়া, ইউরোপের মধ্য দিয়া ট্রেণে 'ব্রিন্দিসি' আসিয়া সেখান হইতে জাহাজে করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিলাতে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন যাত্রা প্রণালী সম্পর্কে জানিবার জন্য মনে কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। সুগঠিত ব্যক্তিত্ব এবং অভীষ্ট বিষয় সম্পর্কে গভীর অনুরাগ লইয়া তিনি বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। জ্ঞানের মহিমায় তাঁহার অন্তর-লোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঔজ্জ্বল্যে নিবদ্ধ-দৃষ্টি প্রফুল্লচন্দ্রের মন হইতে বাহ্য বস্তু সম্পর্কে সমস্ত আকর্ষণ একেবারেই খসিয়া পড়িয়াছিল। তাই বৈদেশিক সভ্যতার জাঁকজমক, এবং বিলাসিতা ও সহজ প্রলোভনের সহস্র উপকরণ তাঁহার চিত্তকে কোন দিনই বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সাধনার সূক্ষ্ম পথ বাহিয়া লক্ষ্যের শেষ সীমায় পৌঁছিবার একাগ্র সাধনায় তাঁহার মন একান্ত ভাবে সমাহিত ছিল। বাল্যকাল হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়া ছিলেন। যুক্তির নিকষে পরীক্ষা না করিয়া কোন আচারই তিনি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার মন প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু বৈদেশিক আচার ব্যবহারকে কোনদিনই তিনি প্রগতিশীলতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন না। আচার ও পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন— প্রফুল্লচন্দ্র কোন দিনই 'সাহেব' বনিয়া যান নাই।

বিলাতে তিনি চোগাচাপকান যুক্ত ভারতীয় পোষাকই পরিধান করিতেন। স্বল্প মূল্যের অথচ পুষ্টিকর খাদ্য তাঁহার আহার্য্য ছিল। মাদকদ্রব্যের ব্যবহার তিনি সর্ব্বদাই পরিহার করিয়া চলিতেন। ইটালীর ষ্টেশনগুলিতে তৎকালে জলের পরিবর্ত্তে সস্তা হালকা মদ্যের ব্যবস্থা ছিল। দেশে ফিরিবার পথে জলের অভাবে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট

পাইতে হয়। প্রত্যেক সময়ই তাহাকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের কলের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল; তবু সহজলভ্য-হালকা মদ্যের দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণের প্রবৃত্তি তাঁহার একবারও হয় নাই। বৈদেশিক সভ্যতার বাহ্য আড়ম্বরের দৃষ্টি বিভ্রমকারী দীপ্তি দেশের বহু যুবকের অপরিমেয় ভবিষ্যৎ সমূলে নষ্ট করিয়া দেয়। সেই সকল চঞ্চলমনা যুবকের পক্ষে প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাতের জীবন-যাত্রা-প্রণালী আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত।

শিক্ষাব্রতী প্রফুল্লচন্দ্র

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে ফিরিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র মাতার সহিত দেখা করিবার জন্য স্বগ্রাম রাড়ুলীতে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ ছয় বৎসর অদর্শনের পর এই কন্যা-বিয়োগ-বিধুরা মাতার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎকার বিষাদ-আনন্দের সংমিশ্রনে বড়ই করুণ ও উচ্ছ্বাসময় হইয়াছিল। বাড়ীতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে কর্ম্মপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়াই এদেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৮৮৯ সালের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে একরূপ বেকার অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। বিদেশে আহৃত জ্ঞান প্রয়োগক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল; গবেষণাগারের নীরব আহ্বান তাঁহাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল; অথচ অবস্থার প্রতিকূলতা বশতঃ তাঁহার মত কর্ম্মপ্রয়াসী ব্যক্তিকে হাত পা গুটাইয়া

বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। জীবনের এই অবস্থা তাঁহার নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং অশান্তিকর হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে তিনি মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়া সম্পর্কিত একটি ঘটনায় প্রফুল্লচন্দ্রের সবল, স্বাধীন ও তেজস্বী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয়দিগের যোগ্যতায় তাঁহার গভীর আস্থা ছিল। জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণ-বুদ্ধি-পরিচালিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এদেশী যোগ্যতাকে দাবাইয়া রাখিতে চাহেন—লণ্ডনে থাকিতে প্রফুল্লচন্দ্র তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণচর্ম্ম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া, ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে তাঁহার ন্যায় গুণীলোকের পক্ষে ন্যায্যপ্রাপ্য পদ হইতে তাঁহাকে কি ভাবে বঞ্চিত করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁহার মন অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবিচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য তিনি দার্জ্জিলিং যাইয়া শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর 'ক্রফট্' সাহেবের সহিত দেখা করেন। ব্রিটিশ জাতি সম্পর্কে দেশবাসীর তদানীন্তন অনুকূল মনোবৃত্তির কথা স্মরণ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের এই আচরণের কথা বিচার করিলে প্রফুল্লচন্দ্রের এই তেজস্বিতা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব। 'ক্রফট্' সাহেবের উক্তিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"আপনার জন্য জীবনে অনেক পথ খোলা আছে; কেহ আপনাকে এই পদ গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করিতেছে না। ....'এডিনবরা' বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডি. এস-সি. কখনও প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে চাকরির জন্য লালায়িত হয় না।"

দৈবের ইঙ্গিত বুঝি ক্রফটের ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ক্রফটের

এই কর্কশ বাক্যই বুঝি প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে অমৃত বহন করিয়া আনিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র এই অন্যায়ের প্রতিবাদে অধ্যাপক পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই সত্য, কিন্তু কে জানে ক্রফটের এই জ্বালাময় শ্লেষ বাক্য দিনের পর দিন কার্য্যের অবসরে তাঁহার মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে উত্তরোত্তর ব্যবসায়মুখী করিতেছিল কিনা ?

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি উক্ত কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞান কলেজই প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরবাড়ী ছিল।

সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখান হইতেই তাঁহার অধ্যাপনা ও মৌলিক গবেষণার যশোভাতি বিশ্বের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সৃজনশীল মনের সাহচর্য্যে এবং অনন্যসাধারণ অধ্যাপনা কৌশলে অসংখ্য ছাত্রের মনে স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক গবেষণার প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে এখানে তিনি যে বিজ্ঞানের আলো জ্বালিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমে ক্রমে সারা ভারতকে আলোকিত করিয়াছিল, এবং সেই আলোকে সঞ্জীবিত হইয়া ভারতের লুপ্ত জ্ঞানচর্চ্চা অলৌকিক সম্ভাবনায় বিকশিত হইয়া বিশ্ব সভার জ্ঞানের

আসনে ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহারই নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞান-সাধনা অসংখ্য যুবকের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছিল। আমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই সাধনার বিশিষ্ট রূপটিকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—"যাহারা রসায়ন শাস্ত্র প্রথম শিখিতেছে, এমন সব ছাত্রের শিক্ষকতায় সাফল্য-লাভ করিতে হইলে এক্স্পেরিমেন্ট বা পরীক্ষার কাজে নৈপুণ্য চাই।" পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ব্যতীত পরীক্ষার কার্য্যে তৎপরতা লাভ হয় না। তৎপরতার অভাবে আলোচ্য বিষয় নীরস হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ছাত্রেরা যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিয়া যায়; অন্তরের স্পর্শে সে কাজ কোন দিনই আনন্দজনক ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে না।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কার্য্যে যোগদান করেন, 'পেড্‌লার' সাহেব তখন রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার সহকারী হিসাবে চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী পরীক্ষাগারের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইঁহাদের উভয়েরই লেবরেটরীর কার্য্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র "হোপ প্রাইজ স্কলার" হিসাবে অধ্যাপকের সহকারী রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহারও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তথাপি অধিকতর তৎপরতা লাভের জন্য তিনি লেবরেটরীর কার্য্যে 'পেডলার' ও চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপনার সফলতা লাভই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং তিনি সম্পূর্ণ নিরভিমান ছিলেন। বিদ্যাভিমানী বা অহমিকাপরায়ণ হইলে, 'এডিনবরা' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধিপ্রাপ্ত প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে একজন

অধীনস্থের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করা কখনই সম্ভবপর হইত না। অন্যান্য অনেক অধ্যাপকের মত মাত্র যন্ত্রটি দেখাইয়া অথবা বোর্ডে তাহার চিত্রাঙ্কন করিয়া অনায়াসেই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতেন।

কৃতী অধ্যাপক রূপে প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইলে অধ্যাপনার ব্যবহারিক কৌশল পর্য্যালোচনা না করিয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তর্লোকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে হইবে। জ্ঞান আহরণে তাঁহার আনন্দ, জ্ঞান বিতরণেও তাঁহার আনন্দ,—জ্ঞান আনন্দের উৎসরূপে শৈশব হইতে তাঁহার জীবনে যে আবেগ সৃষ্টি করিতেছিল, জ্ঞানের অনুকূলে তাহাই তাঁহার জীবনকে ছন্দায়িত করিয়া তুলিয়াছিল। এই আনন্দের উন্মাদনায় জীবন ছন্দের তালে তালে নাচিয়া চলিয়াছিল এবং পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সাধনা, প্রয়োগকুশলতা—সকলই এই জীবনছন্দের বাহ্যিক রূপ হিসাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আনন্দ হইতেই ইহাদের জন্ম, তাই ইহারা তাঁহার জীবনকে কোনদিনই ক্লিষ্ট বা অবসন্ন করে নাই। ছন্দের স্পন্দনে ইহারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, যেখানে যে রূপটি কার্য্যপ্রদ, সেখানেই ততটুকু সেই রূপেই প্রকটিত হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন জ্ঞানের আনন্দে ছন্দায়িত বলিয়া তাঁহার অধ্যাপনা সফল হইয়াছে, এবং তাঁহার জীবন বহু জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ভারতে বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল।

অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হইয়া তিনি উৎসাহের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিযুক্ত হইবার তিনমাস পরে 'পেড্‌লার' সাহেব ছুটি লইলেন। সুতরাং রসায়ন বিভাগের সমস্ত ভার প্রফুল্ল-

চন্দ্রের উপর পড়িল। প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—"শিক্ষক জীবনে ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মবহুল সময়।" কখন কখন তাঁহাকে পর পর তিনটি ক্লাসে বক্তৃতা দিতে হইত। তাঁহার এই সময়ের উপলব্ধির কথা তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে—"কাজেই ছিল আমার আনন্দ এবং যে হেতু আমি এই কাজে এক নূতন উন্মাদনা বোধ করিলাম, সেই জন্য এই গুরুভার বহন করিতে আমার কোন ক্লান্তি হইল না।"

অধ্যাপনা অধ্যয়নের পারিপূরক—উভয়ের যুগপৎ চর্চ্চায় জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যাপনাকে তাঁহার জ্ঞান সাধনার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যন্ত্রধর্ম্মী মন নিখুঁত শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণে কারখানা হইতে সহস্র সহস্র পণ্যজাতের ন্যায় অসংখ্য ছাঁচে-ঢালা জ্ঞানের বাহক গড়িয়া তুলিতে পারে, কিন্তু সেই জ্ঞানকে গবেষণা, উদ্ভাবন ও আবিষ্ক্রিয়ার মোহনীয় সৃজনশীলতায় বিচিত্র ও মনোহর করিয়া তুলিতে হইলে, প্রাণের স্পর্শে শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হয়। অধ্যাপনাকালে প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবলোক আন্দোলিত হইত—প্রাণ আনন্দে মাতিয়া উঠিত। তাই তাঁহার শিক্ষা সকলের অন্তর স্পর্শ করিত। নীরস শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন আগুনের সংস্পর্শে আগুন হইয়া উঠে, প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞানধর্ম্মী মনের সংস্পর্শে আসিয়া সকল ছাত্রেরই মন তেমনিই জ্ঞানধর্ম্মী হইয়া উঠিত।

কলেজের কোন ক্লাস বা শ্রেণীকে সমষ্টিগত অস্তিত্ব হিসাবে তিনি কোনদিনই বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার কল্যাণকামী দরদী মন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ছাত্রের সম্পর্কে কৌতূহলী ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সৌহার্দ্দপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক শিক্ষার পক্ষে যে কিরূপ

প্রয়োজনীয়, প্রফুল্লচন্দ্রের 'আলবার্ট' স্কুলের শিক্ষার অভিজ্ঞতা হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। তিনি বিদ্যামন্দিরের চারিটি দেওয়ালের মধ্যে ছাত্র-অধ্যাপকের মিলন-ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। হিন্দু হোষ্টেলে তিনি বহু সময় ছাত্রদের মধ্যে কাটাইতেন। তিনি ছাত্রদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের খুঁটিনাটি সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা—জীবনের সকল অবস্থার সহিত পরিচিত হইতেন—তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতেন, অসুবিধায় সাহায্য করিতেন এবং তাহাদের সুখে প্রাণখোলা আনন্দ করিতেন। এইরূপ আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাঁহার হাসিগল্প, অমায়িক ব্যবহার, ভাবপ্রদীপ্ত মুখচ্ছবি, আদর্শ-নিষ্ঠা—সকলই অজ্ঞাতে ছাত্রদের মনকে প্রভাবিত করিত। এইভাবে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন হইতে জ্ঞানস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়িয়া ছাত্রদের হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানের আগুন জ্বালাইয়া দিত।

কলেজে বক্তৃতা দানের প্রচলিত রীতিকে তিনি অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বক্তৃতা দ্বারা আলোচ্য বিষয় ছাত্রদের নিকট আদৌ সহজবোধ্য হয় না। ইহা ছাত্রদের মনে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ এবং হৃদয়ে গবেষণা প্রবৃত্তির উন্মেষ সাধনে কোন সহায়তা করে না। প্রফুল্লচন্দ্র স্পষ্টই বলিয়াছেন—"যদি কোন ছাত্র সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে চায়, তাহা হইলে সে দেখিবে যে, এই সব বক্তৃতায় ক্লাস হইতে অনুপস্থিত থাকাই তাহার পক্ষে বেশী লাভজনক।" পুস্তক-নিবদ্ধ বা অধ্যাপক-বিবৃত কোন সত্যকে স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া না লইয়া ন্যায়শাস্ত্রানুগ বিচার-বিতর্কের দ্বারা ছাত্র স্বয়ং যদি সেই সত্যকে সিদ্ধান্তরূপে গড়িয়া তুলিতে পারে, তবেই তাহার বুদ্ধির প্রকৃত অনুশীলন করা হয়।

ক্লাসে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক অনুসরণ করিয়া চলার প্রথাকেও তিনি অত্যন্ত দূষণীয় মনে করিতেন। তিনি নিজেও তাঁহার পঠদ্দশায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে কোনদিনই তাঁহার বুদ্ধিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে যে সীমাহীন জ্ঞানভাণ্ডার, সেখান হইতেই আচার্য্যদেব তাঁহার মনের খোরাক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া একই বিষয় বিশ জনের মুখে শুনিলে বা বিশ জনের লেখায় অধ্যয়ন করিলে, সেই বিষয় সম্পর্কে বলিবার ও লিখিবার একটা স্বাধীন ও নিজস্ব ভঙ্গী গড়িয়া উঠে। পরন্তু সেই বিষয় একজনের মুখে শুনিলে, বা একজনের লেখায় অধ্যয়ন করিলে, সেই বাক্যের প্রত্যক্ষ অর্থ ও পরোক্ষে তাহার সহিত যে সকল তাৎপর্য্য জড়াইয়া থাকে, তাহা সম্যক উপলব্ধি হয় না এবং ছাত্রকে ভুল করিবার আশঙ্কায় ভয়ে ভয়ে কথা বলিতে হয়। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্র একই বিষয় সম্পর্কে বহু পুস্তক অধ্যয়ন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

এই মনোভাব লইয়া যিনি অধ্যাপনা কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ছিলেন, অথবা অধ্যাপনা কার্য্যে লিপ্ত থাকা কালে এই মনোভাব যাঁহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তিনি যে অধ্যাপনা রীতির বাধ্যতামূলক অঙ্গ অব্যাহত রাখিয়াও নিজের চিন্তার ও আদর্শের অনুকূলে ছাত্রদের মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলিবার মত স্বাধীন পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন—তাহাতে বিচিত্রতা কি? তাহার "আত্মচরিতে" ছাত্রদের অধ্যাপনা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :—

"স্বয়ংপ্রভ ব্যক্তিত্বের মাহমায় যাঁহার জীবন আপনা হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তিনি স্বভাবতঃই অভিমানশূন্য হন। প্রফুল্লচন্দ্র একই কারণে অভিমানশূন্য ছিলেন। অপরের জীবন সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট

মর্য্যাদাজ্ঞান ছিল। সেইজন্য অপরের কার্য্যের উপযুক্ত মূল্য দিতে তিনি কোন দিনই কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চ্চার যে বিপুল প্রয়াস ও অভূতপূর্ব্ব সফলতা পরিলক্ষিত হয়, অন্যান্য কারণের মধ্যে এই দুইটি কারণেই তাহা বিশেষভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার আত্মকর্ত্তৃত্বের মোহ তাহাদের স্বাধীন চিন্তার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই। পরন্তু, মূল বস্তুটিকে লক্ষ্যে রাখিয়া ভাবিবার ও কার্য্যক্রম অনুসরণ করিবার অবাধ অধিকার তিনি তাহাদের দিয়াছিলেন। এই দুইটি কারণ বশতঃই তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের মনে আত্মপ্রত্যয় ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইত। আত্মপ্রত্যয় তাহাদিগকে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিত এবং গবেষণা কার্য্যে প্রেরণা দান করিত এবং দায়িত্ব-বোধ বিষয়ান্তরে ভ্রমণশীল মনকে সংযত করিয়া কর্ত্তব্য সম্পর্কে তাহাদিগকে নিষ্ঠাবান করিয়া তুলিত। তাঁহার পরিচালনাধীনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাকারী ছাত্রগণ যে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের এই সকল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই তাহার অন্যতম কারণ রূপে বিদ্যমান ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অধ্যাপনাগুণে মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় বহু প্রতিভাবান ছাত্র তাঁহার পাদমূলে একত্রিত হইয়াছিল। তাঁহার দরদী মনের সান্নিধ্যে এই সকল তরুণের চিত্ত-লোক সহজে উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞাননিষ্ঠা ইহাদের জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার অধ্যাপনা-কৌশল ইহাদের সম্ভাবনাময় জীবনকে কৃতিত্বে ও গৌরবে বিকশিত করিয়াছিল।

এই জ্ঞানানন্দময় তপস্বীকে কেন্দ্র করিয়া এইভাবে ভারতে রাসায়নিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। বাংলার যে সকল বৈজ্ঞানিক মৌলিক গবেষণা দ্বারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে গবেষণা দ্বারা খ্যাতি লাভ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের অভিলাষ কি পরিমাণে সফল হইয়াছিল, তাহা এই ব্যাপার হইতেই আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি।

বিদেশে শিক্ষালাভ ব্যতীত এ দেশের বিজ্ঞানাগারে গবেষণা দ্বারাও যে মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার সম্ভব, Ghose's Law এবং Saha's Equation তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ভাবে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা গুণে ভারত আজ বিজ্ঞান জগতে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছে এবং কলিকাতা নগরী বিশ্বের বিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

এইভাবে আপনাকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিলাইয়া দিয়া প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে বহু হইয়া জ্ঞানময় সত্তায় ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কল্পনায় দেশমাতৃকার যে জ্ঞানগরিমাদীপ্ত মহৎ আলেখ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে তাঁহারই জীবদ্দশায় তিনি সেই কল্পনাকে রূপায়িত হইতে দেখিয়া গিয়াছেন। মেঘনাথ সাহা, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং আরও অসংখ্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণার দানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং এই পরাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কৃত তথ্য আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র সমাদরে পঠিত হইতেছে। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশাতে এই সকল বৈজ্ঞানিকের সম্মিলনে ভারতীয়

রাসায়নিক গোষ্ঠীর (Indian School of Chemistry) গোড়াপত্তন করিয়া যান এবং ভারতে প্রকাশিত ইহারই মুখপত্রে বৈজ্ঞানিকদিগের মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার রীতি প্রবর্ত্তন করেন।

ব্যক্তিবিশেষের জীবন কোন বিশিষ্ট সময়ের কোন বিশিষ্ট পরিবেশ গঠনে যে কি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীসের সক্রেটিসকে কেন্দ্র করিয়া মানবজাতির দার্শনিক চেতনা কি অপূর্ব্ব সুষমায় না ফুটিয়া উঠিয়াছিল! অতিকায় মন্থরানুভূতি প্রাগৈতিহাসিক জীবের ন্যায় ইউরোপের স্থবির ধর্ম্মজীবন মার্টিন লুথারের এক ধাক্কায় নূতন করিয়া বাঁচিয়া উঠিল। কত নূতন ভাবধারায়, কত পবিত্র জীবনের আদর্শেই না তাহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল! বস্তুতঃ, প্রফুল্লচন্দ্র গতানুগতিক ভাবের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আবর্ত্তিত বাঙ্গালীর মলিন ও মৃতপ্রায় চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞানিকতার নূতন খতে প্রবাহিত করিয়া তিনি বাঙ্গালীর তথা ভারতীয়ের বুদ্ধিকে সজীব ও সৃজনশীল করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হওয়া তাঁহার জীবনের বড় কথা নহে। তাঁহার জীবনের যে প্রভাব দেশে বিজ্ঞান অনুশীলনের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই জাতিকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার আত্মবিতরণকে সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় বলিতে হয়—

"উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বল্‌লেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে

অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।”

গবেষণা ও রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন

প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণাকার্য্য অধ্যাপনার সহিত একযোগেই চলিয়াছিল। অধ্যাপনার পর অবসর সময়ে তিনি গবেষণায় মগ্ন থাকিতেন। বাজারে ক্রয়লব্ধ ঘৃত ও তৈল বিশুদ্ধ ছিলনা। তাহাদের সহিত কতটা পরিমাণে ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত আছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি এদেশজাত ঘৃত এবং তৈল লইয়া প্রথমে গবেষণা কার্য্য আরম্ভ করেন। তিন বৎসর প্রভূত পরিশ্রমের পর তাঁহার গবেষণার ফলাফল তিনি ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ‘জার্ণাল অফ দি এসিয়াটিক সোসায়িটি অব বেঙ্গল’ নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময় দেশীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অভাব তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শিক্ষার্থীরা যদি বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান আলোচনার অনুকূল মনোভাব গড়িয়া উঠে। ইহা বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র প্রাণীবিজ্ঞান সম্পর্কীয় একখানি প্রাথমিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ লিখিবার জন্য তাঁহাকে প্রাণীবিজ্ঞান

সম্পর্কে বহু প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল। এই সময় বিভিন্ন প্রাণীর অস্থি ও পেশী সংস্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য তিনি তাহাদিগের দেহব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু লইয়া এই সময় তিনি একটি "নেচার ক্লাব" প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন উক্ত কলেজের রসায়ন বিভাগ একটা পুরাতন একতলা বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। উহার গবেষণাগারে উপযুক্ত বায়ু সঞ্চালন ও দূষিত গ্যাস নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ টনী সাহেবের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করেন। ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নাগার তৎকালীন ইউরোপীয় বড় বড় গবেষণাগারের আদর্শ লইয়া উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দে রসায়ন বিভাগ এই নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হইল। এখন হইতে প্রফুল্লচন্দ্র নূতন উৎসাহে গবেষণা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ভারতীয় ধাতু লইয়া তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন। ঐ সকল ধাতু বিশ্লেষণ দ্বারা দুই একটি নূতন পদার্থ আবিষ্কার করা যায় কি না—তাহাই তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁহার গবেষণা ভিন্ন দিকে নিয়ন্ত্রিত হইল। তিনি আকস্মিকভাবে 'মার্কিউরাস নাইট্রাইট' আবিষ্কার করিয়া বসিলেন। এই আবিষ্ক্রিয়া সম্পূর্ণ অচিন্তিতপূর্ব্ব !

রসায়ন ক্ষেত্রে "মার্কিউরাস নাইট্রাইট" তাঁহার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। পারদ শ্রেণীর পদার্থ বিন্যাসে একটি অবকাশ বহুদিন হইতে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদিগের উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। বহু অনুসন্ধানেও

তাঁহারা ঐ অবকাশ পূরণ করিবার মত কোন পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সুতরাং "মার্কিউরাস নাইট্রাইট" আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের যশ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সুধী সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। "মার্কিউরাস নাইট্রাইটের" আনুষঙ্গিক নূতন নূতন মিশ্র পদার্থ আবিষ্কার হইতে লাগিল। তিনিও মহানন্দে পরম উৎসাহে দিনের পর দিন গবেষণায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার এই সময়ের গবেষণার বিবরণ শতাধিক নিবন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গবেষণা মানুষের উচ্চ চিন্তাবৃত্তির পক্ষে নেশাস্বরূপ। গবেষণা-মগ্ন সাধকের সম্মুখে কখন কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্য সিদ্ধির মনোহর মুর্ত্তিতে দেখা দিবে—সেই দুর্ব্বার কৌতূহল বৈজ্ঞানিককে অনন্ত নিষ্ঠার সহিত দিনের পর দিন আত্মভোলা আনন্দে কাজের মধ্য দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়। তাঁহার মগ্ন চিত্ত প্রাত্যহিক স্বাভাবিক প্রয়োজনগুলির কথাও অনেক সময় ভুলিয়া বসিয়া থাকে। নিউটন ও গ্যালিলিওর জীবন চরিত পাঠে এইরূপ বহু আখ্যায়িকার কথা আমরা জানিতে পারি। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে ঐরূপ কোন আখ্যায়িকার সংবাদ আমরা রাখি না। সেই সম্পর্কে কোন কথা জানিবারও সুযোগ আমাদের নাই। তবে গবেষণা কার্য্যে তিনি কি বিপুল আনন্দ পাইতেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—এই নবোন্মুক্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিচরণ করা এবং তাহার অজ্ঞাত স্থান সমূহ আবিষ্কার করা—ইহাতে প্রতি মুহুর্ত্তে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইত। তিনি অন্যত্র "অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের" গবেষণা সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"এই গবেষণায় প্রায় দুই মাস সময়-লাগিয়াছিল। কোন কোন সময় একাদিক্রমে ১০।১২ ঘণ্টা পরীক্ষ

কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্তু বিষয়টি এমনই কৌতুহলপ্রদ যে, কাজ করিতে করিতে সময়ের জ্ঞান থাকিত না। প্রত্যহ পরীক্ষা-কার্য্যের পর নীলরতন ধর যখন ফলাফল হিসাব করিতেন আমি অধীর আনন্দে প্রতীক্ষা করিতাম।”

এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল, পদমর্য্যাদার গৌরব যাঁহাদের চিত্তকে অভিভূত না করে। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট গবেষণার আনন্দের সহিত তুলনায় পদমর্য্যাদাজনিত গৌরব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়াছিল। জুনিয়র গ্রেডে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেও, প্রফুল্লচন্দ্র ক্রমে সিনিয়র গ্রেডে উন্নীত হন এবং কর্ত্তৃপক্ষ রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। কিন্তু ঐ পদ গ্রহণ করিলে তাঁহার গবেষণা কার্য্য ব্যাহত হইবে—এই আশঙ্কায় তিনি ঐ পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সেদিন দূর মফঃস্বলে বহুমানাস্পদ ক্ষমতাগর্ব্বী অধ্যক্ষের পদ অপেক্ষা কলিকাতায় বিদ্যার আবেষ্টনীর মধ্যে গবেষণার অনুকূল পরিবেশে একজন জুনিয়র অধ্যাপকের পদও তাঁহার নিকট অধিকতর লোভনীয় মনে হইয়াছিল। এই সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ মার্টিনকে জানাইয়াছিলেন —“আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। এখানে বরং আমি জুনিয়র অধ্যাপক রূপে সানন্দে কাজ করিব।” বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্রকে অবশ্য জুনিয়র গ্রেডে অবনমিত হইতে হয় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যিক ঝোঁক কোনদিনই তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। কৈশোরে আপনা হইতেই এই ঝোঁক তাঁহার ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার টেষ্ট টিউব নিয়ন্ত্রণে সুদক্ষ হস্ত লেখনী

চালনাতেও কম দক্ষ ছিল না। বিলাতে অবস্থান কালে তাঁহার লিখিত ভারত সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইতিহাস, জীবনী ও ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের ফলে তাঁহার মন ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি কপস্, বার্থেলো প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদিগের প্রণীত রসায়ন শাস্ত্রের প্রামাণ্য ইতিহাসগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। আরব, গ্রীস প্রভৃতি দেশের এ্যালকেমিষ্টদের আবিষ্কার-কাহিনী ইঁহাদের গ্রন্থে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন।

কুয়াসাচ্ছন্ন অতীত দিনের ইতিহাসের ছিন্ন পত্র সংযোজনা করিয়া ভারতের রাসায়নিক ঐতিহ্যের তথ্যাবিষ্কারের আকাঙ্খা তাঁহার স্বদেশ-প্রেম মুগ্ধ চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে পাইয়া বসিয়াছিল। পর্ব্বতোদ্গমনের ন্যায় এই কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ ছিল। যুক্তিবাদী নিরপেক্ষ মননশীলতা, সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার, এবং রসায়ন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ব্যতীত এই কার্য্য সম্পাদন করা একরূপ অসম্ভব ছিল। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে দীর্ঘকালব্যাপী ধারাবাহিক পরিশ্রমেরও একান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে প্রথম তিনটি গুণের সমাবেশ থাকিলেও, তাঁহার রোগজীর্ণ দেহের পক্ষে আয়াসসাধ্য কার্য্যভার গ্রহণ করা, সাধারণ বুদ্ধিতে, আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—অধ্যাপনা ও গবেষণায় তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত এবং অনিদ্রা ও অজীর্ণ রোগ বশতঃ সন্ধ্যার পর তিনি কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন না।

অপ্রত্যাশিত দিক হইতে প্রেরণা আসিয়া তাঁহার মনকে কর্ম্মোদ্দী-

বিজ্ঞানাগারে প্রফুল্লচন্দ্র

পনায় চঞ্চল করিয়া তুলিল। ফ্রান্সের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার 'বার্থেলো' অতীত ভারতের রসায়নচর্চ্চা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখেন। তদ্ব্যতীত 'Journal de Savants' নামক সাময়িক পত্রের একটি প্রবন্ধে বার্থেলো Savant বা মনীষী বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া রাসায়নিক তথ্যাবিষ্কার এবং অসংখ্য মৌলিক রচনা দ্বারা যিনি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার নব নব সম্পদে পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ রসায়নবিদের নিকট এই জাতীয় সম্মান লাভ একজন নবীন এবং তাঁহার তুলনায় অখ্যাতনামা অধ্যাপকের চিত্তকে কিরূপ উল্লসিত করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—"আমার মনে ধারণা হইল যে, কোন উচ্চতর সৃষ্টি কার্য্যের জন্য আমার জীবন বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" প্রফুল্লচন্দ্র কার্য্যের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়াও বিপুল আগ্রহে রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বগামী কেহই ইহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখিয়া যান নাই। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। রসায়ন বিষয়ে হস্তলিখিত পুঁথি হইতে তাঁহাকে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান ও ইংলণ্ড হইতে এই সকল পুঁথি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কোন পুথি ভূমিকাশূন্য, কোন খানির উপসংহার ছিন্ন হইয়াছে, কোন খানিতে পাঠান্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—এইরূপ একই বিষয়ের বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিতে হইয়াছে। এই কার্য্যে পণ্ডিত নবকান্ত

কবিভূষণ প্রত্যহ তাঁহাকে ৪।৫ ঘণ্টা সাহায্য করিতেন। যাহা হউক, এই ভাবে রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রাচীন কাল হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতে রসায়ন আলোচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা তিনি বিপুল যশের অধিকারী হইলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে তাঁহার পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইল। স্বয়ং বার্থেলো 'Journal de Savants' নামক সাময়িকীতে এই গ্রন্থের পনের পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী কালে বহু মনীষী তাঁহাদিগের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস হইতে অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস ১ম খণ্ড প্রণয়ন করিবার সময় নব্য রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রগতির সহিত তাঁহার যোগাযোগ কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি কিছুদিন ইতিহাস প্রণয়ন কার্য্যে বিরত ছিলেন। এই সময় তিনি একবার ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা পরিচালিত গবেষণাগার পরিদর্শন করিয়া আধুনিকতম গবেষণা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ভারত সরকারও এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। ১৯০৪ সালে আগষ্ট মাসে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। ইউরোপে তিনি ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করেন; আধুনিকতম গবেষণার ধারা ও তদানুষঙ্গিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সহিত পরিচিত হন এবং এই উপলক্ষে তিনি বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করেন। প্রত্যেক স্থানেই সুধীমণ্ডলী আন্তরিক সমাদরে তাঁহাকে আপ্যায়িত

করিয়াছিলেন। প্যারি সহরে বৌদ্ধ সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ভারতবন্ধু সিলভঁ্যা লেভির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে, তাঁহার মধ্যস্থতায় প্রফুল্লচন্দ্র ফরাসী বিজ্ঞানাচার্য্য বার্থেলোর সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। এইভাবে স্বদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার জন্য নবীন প্রেরণা ও উৎকৃষ্টতর অভিজ্ঞতা লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসেন।

১৯০৮ সাল হইতে প্রফুল্লচন্দ্র পুনরায় রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়নে মনঃসংযোগ করিলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই সম্পর্কে বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ ব্রজেন্দ্র লাল শীল তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পনের বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁহার হিন্দু রসায়নের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইল। রসায়ন ক্ষেত্রে তাঁহার দানের কথা বিবেচনা করিয়া ১৯১২ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রফুল্লচন্দ্রকে D. Sc. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপলক্ষে "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস" সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন—কেবল বিজ্ঞানের দিক দিয়া নয়, ভাষা জ্ঞানের দিক দিয়াও এই গ্রন্থে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; এবং গ্রন্থ সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহার সিদ্ধান্তগুলিতে কোন অস্পষ্টতা নাই এবং শেষ কথা বলা হইয়াছে।"

এই গ্রন্থ রচনায় প্রফুল্লচন্দ্রকে দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বিধাতা অপরিমেয় কর্ম্মশক্তি দিয়া তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই বিপুল পরিশ্রমের চাপে তাঁহার রোগজীর্ণ দেহ যে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার

রহস্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই বিবৃত করিয়াছেন—"কাজে যখন আনন্দ পাওয়া যায়, তখন তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয় না। বরং উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।" নেপোলিয়ান সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি একাদিক্রমে কয়েক দিবস দিনে ৫।৭ মিনিটের বেশী নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতে পান নাই। অথচ তাঁহার বিশ্রাম বঞ্চিত দেহে গ্লানি অথবা মনে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এখানেও, আনন্দ তাঁহার কর্ম্মের প্রেরক ছিল। জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে ইঁহাদের কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত নহে। কার্য্যের জন্যই ইঁহারা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন; তাই কার্য্যের আনন্দ তাঁহাদের জীবনীশক্তিকে সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা দান করিয়াছিল।

কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য অনুযায়ী প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জীবন ধারাকে চারিটি অংশে ভাগ করা যায়;—১। তাঁহার আবিষ্কার, ২। তাঁহার রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন; ৩। তাঁহার ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠী গঠন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জাতির আত্মচেতনা ও আত্ম-প্রত্যয়ের উন্মেষ সাধন ৪। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা।

প্রথম তিনটি সম্পর্কে তাঁহার জীবন ধারা আমরা আলোচনা করিয়াছি; পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব কোন্ সংগঠন শক্তি ও ব্যবসায় বুদ্ধির বলে তিনি গোটা কয়েক শিশি বোতল লইয়া আরব্ধ ব্যক্তিগত নগণ্য কারবারকে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ব্যবসায়ী প্রফুল্লচন্দ্র

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন আমরা পর্য্যালোচনা করিলাম। এইবার আমরা ব্যবসায়ী প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রফুল্লচন্দ্রকে অবিশেষিত ভাবে ব্যবসায়ী বলিলে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখা হয়। সাধারণতঃ, ব্যবসায়ীরা আত্মসুখের জন্য ঐশ্বর্য্য গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। দরিদ্র নিজের ও পরিজনবর্গের জীবন যাত্রায় প্রাচুর্য্য কামনা করিয়া ব্যবসায়কে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের সুখ সাধারণ মানুষের সুখ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি দরিদ্র ছিলেন না,—তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, 'রাজার হালে' বাস করিলেও তাঁহাকে কোনদিনও অভাবে পড়িতে হইত না। পরিজন বলিতে তাঁহার নিকট কেহ ছিল না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহার মুক্ত হৃদয়ের প্রীতি প্রবাহ ব্যাপ্তিতে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং তাহাতে সেই স্বজন ও পরজন সকলই একাকার হইয়া গিয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার 'আত্মচরিত'-এ একস্থানে বলিয়াছেন "আমি এপিক-টেটাসের শিষ্য এবং ডাইওজিনিসের অনুরাগী; কৌপীনধারী মহাত্মা গান্ধী আমার শ্রদ্ধার পাত্র—অনাড়ম্বর সরল জীবন এবং জ্ঞানচর্চ্চাই আমার জীবনের আদর্শ"। এই সংসার-বিরক্ত জ্ঞানতপস্বী—বস্ত্রের দৈন্য যাঁহার অঙ্গের পরিচ্ছদ হইয়াছিল—তাঁহার পক্ষে একটি বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন্ বিশিষ্ট লক্ষ্য তাঁহার জীবনের কেন্দ্রে থাকিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রেরণা দান করিয়াছিল, তাহাই আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

মহৎ মন কখনও ক্ষুদ্র চিন্তার দ্বারা চালিত হয় না। প্রফুল্লচন্দ্র নিজের লাভের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হন নাই। যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই বিরাট মহৎ জাতীয় কল্যাণে পরিসমাপ্ত হইয়াছে—তাহাই জাতির আত্মপ্রত্যয় গড়িয়া তুলিয়াছে—তাহাই জাতির

সুবৃহৎ সম্ভাবনাকে তাহার চোখের সম্মুখে প্রোজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।

নিশ্চিন্ত খাওয়া পরা ও নিশ্চিন্ত অবসর জাতির জীবনে সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। বাঙ্গালীর জীবনে এই দুইটির অসদ্ভাব কোনদিনই ছিল না। ফলে, বাঙ্গালী এমনই এক শিক্ষার ও সংস্কৃতির বিচিত্র পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহা সারা ভারতের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। বাঙ্গালী তাহা বুঝিতে পারে নাই। বন্দরে নোঙ্গরকরা জাহাজের ন্যায় আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া বাঙ্গালী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পথ চলিতেছিল। চরম দুর্দ্দশা পচনশীল ক্ষতের মত তাহার অর্থনৈতিক জীবনকে তলদেশ হইতে খাইয়া চলিয়াছে—তাহা সে কোন দিনই উপলব্ধি করিতে চাহে নাই। সর্ব্বগ্রাসী অন্নের বুভুক্ষার মুখে বাঙ্গালীর সমস্ত গৌরবের বস্তু যে কবলিত হইতে যাইতেছে, বাঙ্গালী যে ক্ষয়শীল জাতি হইতে চলিয়াছে,—ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দিব্য দৃষ্টিতে প্রফুল্লচন্দ্র বুঝি তাহার বীভৎস করুণ দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই ভবিষ্যৎ চরম দুর্দ্দিনের সম্পর্কে তিনি বৎসরের পর বৎসর রচনা ও বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গালীকে সাবধান করিয়া আসিয়াছেন।

সেই দুর্দ্দিন প্রতিরোধকল্পে বাঙ্গালীর কলেজী শিক্ষায় মোহগ্রস্ত মনকে ব্যবসায়মুখী করিবার জন্য তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছিলেন প্রত্যেক প্রগতিশীল জাতির জীবনে শিল্প ও ব্যবসায় অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প ও বাণিজ্য জাতির ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে, বর্দ্ধিত ঐশ্বর্য্য জাতির জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিয়া তুলে, আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহারিক প্রয়োগ-

কুশলতা দ্বারা রূপায়িত হইয়া মানুষের অশেষ কল্যাণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। তিনি সভয়ে দেখিতেছিলেন—বৎসরের পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সহস্র সহস্র গ্রাজুয়েট বাহির হইতেছে। তাহাদের শতকরা দশজনও কোন লাভজনক চাকুরি পাইতেছে না। এই ভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। জীবন যাত্রা সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল না হওয়ায় এবং সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবে ইহারা কর্ম্মশক্তিহীন ও অলস [illegible] ভাগ্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতেছে। এইভাবে বাঙ্গালী জাতি উদ্যোগহীন ও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। অপর দিকে বাঙ্গালীর আরাম প্রিয়তা ও অবহেলার সুযোগে বাংলার ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলি মাড়োয়ারী, গুজরাটি, বার্ম্মিজ প্রভৃতি উৎসাহী ও পরিশ্রমী জাতিগুলি অধিকার করিয়া বসিতেছে এবং বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব শিল্পগুলি হইতে চীনা, হিন্দুস্থানী কারিগরদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইতেছে। এইভাবে বাংলা হইতে বৎসরে কোটি কোটি টাকা বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। অথচ বাঙ্গালী ক্ষীয়মান সম্পদ পরিপূরণের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। সে মনিবের "হাত তোলা" নির্দ্দিষ্ট অন্নমুষ্টি পাইবার জন্য দ্বার হইতে দ্বারান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

অর্থনৈতিক দুরদৃষ্টের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ বাঙ্গালীর প্রতিভায় ঘুণ ধরিয়াছে। বাঙ্গালীর 'অদ্যতনের চিন্তা ভারতের পরাহের উপজীব্য' আর হইতেছে না। রাষ্ট্রীক ও সামাজিক অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানগুলি নিঃস্ব বাংলার বুক হইতে প্রদেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে। সর্ব্ব ভারতীয় ব্যাপারে বাঙ্গালীর প্রভাব দিন দিনই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে।

প্রফুল্লচন্দ্র তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—বাঙ্গালীকে

বাঁচিতে হইলে, তাহার বিশিষ্ট গৌরবে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইলে, শিল্প প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা তাহার জাতীয় সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। তাই পথদ্রষ্টা ও পথ প্রদর্শক রূপে তিনি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ জাতির কল্যাণ-চিন্তা দ্বারা চালিত হইয়া ব্যবসায়ী হওয়া—জগতের ইতিহাসে প্রফুল্লচন্দ্র বোধ হয় ইহার একক দৃষ্টান্ত স্থল। ধনিকের অছিব্যবস্থা ও অভিভাবকত্বের আদর্শ পরিকল্পনায় প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনই কি নেপথ্যে থাকিয়া গান্ধীজীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ?

প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যবসায়ী জীবনকে দুই দিক দিয়া আমাদের বিচার করিতে হইবে—ব্যবসায় সম্পর্কে তাঁহার মননশীলতা, এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ। চিন্তাশীল প্রফুল্লচন্দ্র এবং কর্ম্মী ও সংগঠক প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁহার ব্যবসায় জীবনে আমরা একাধারে দেখিতে পাই। তাঁহার মননশীলতা ও পরিকল্পনার ব্যাপকতা যেমন তাঁহার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়ক হইয়াছিল, তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, অসুবিধার আঘাত-লব্ধ অভিজ্ঞতা, তথ্যপূর্ণ যুক্তি ও বিচার দ্বারা পরিকল্পিত তাঁহার প্রত্যেক ব্যবসায়-পরিকল্পনাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী রূপ দান করিয়াছিল। সুবিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের ন্যায় বাংলার সুবিস্তৃত অঞ্চলে যেখানে যতটুকু লাভজনক ব্যবসায়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান,—তাহা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর মত উৎপন্নের পরিমাণ, সম্ভাব্য ব্যয় ও লাভের পরিমাণ মিলাইয়া এক একটি সুব্যবস্থিত ব্যবসায়ের পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যুবকের চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট করিতে তাঁহার

চেষ্টার অবধি ছিল না। রংপুরের তামাক এবং বরিশালের সুপারীর ব্যবসায়ে অবাঙ্গালীরা কি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। এখানকার গ্রাজুয়েট তাহাদের অধীনে কেরাণীগিরি করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন করিবে, তবুও নিজেদের উদ্যোগে ব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার ভরসা কোন দিনই তাহাদের উৎসাহিত করে না।

বিশ্ববিখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদিগের জীবন-চরিত তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যে অসাধারণ আত্মনির্ভরশীলতা, উদ্যম, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও বিলাস-বিমুখতা বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের পৌঁছিয়া দিয়াছিল, তাহা এদেশের যুবকদের চরিত্রের বিশেষত্ব হউক ইহাই তিনি একান্তভাবে কামনা করিয়া গিয়াছেন। শুধু যে মুখের কথায় তিনি বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই নহে। কার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাহাদের প্রত্যয়-শূন্য অবশ মনকে আত্মবিশ্বাসী এবং ব্যবসায় সম্পর্কে উদ্যোগী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য বহু ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, প্রধানতঃ তিনি তাঁহার জ্ঞান, শিক্ষা ও সাধনার অনুকূল একটি শিল্পকে ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্রাকারে আরব্ধ এই শিল্পই পরে Bengal Chemical & Pharmaceutical Works নামক বিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হইয়া উঠে।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার 'আত্মচরিতে' বলিয়াছেন—বাংলার সর্ব্বত্র প্রকৃতির যে অজস্র দান ছড়াইয়া আছে, তাহাকে কিরূপে শিল্পের উপাদান রূপে ব্যবহার করা যায়? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনাহার-ক্লিষ্ট যুবকদের মুখে অন্ন যোগাইবার ব্যবস্থা করা যায় কিরূপে? বস্তুতঃ এই উভয় চিন্তাই তাঁহাকে বিচলিত [illegible]াছিল। এই উভয়

চিন্তাদ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি বিভিন্ন বস্তু লইয়া রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার স্বগ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্র নামক এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে একটি সালফিউরিক এসিডের কারখানা এক হাজার টাকায় ক্রয় করেন। পরে উহা লাভজনক না হওয়ায় কারখানা সংশ্লিষ্ট সীসার পাত চারিশত টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলেন। যাহা হউক, অবশেষে তিনি একটি ঔষধের কারখানা খুলিবার মনস্থ করেন এবং Bengal Chemical and Pharmaceutical Works নামে উহার নামকরণ করেন।

প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের দুইটি বিভাগ আছে—একটি উৎপাদন বিভাগ এবং অপরটি বিক্রয় বিভাগ। নূতন কারখানায় প্রস্তুত পদার্থ বাজারে প্রচলিত সমজাতীয় পদার্থের সমকক্ষ অথবা তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর না হইলে বাজারে চলে না। সুতরাং কোন পদার্থ প্রস্তুত সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। বাজারে চালু মাল স্থানচ্যুত করিয়া নিজের কারখানায় প্রস্তুত মালকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা—শিল্পের ব্যবসায় দিক সম্পর্কে ইহাই বড় কথা। এই উভয়দিক হইতেই প্রফুল্লচন্দ্রকে সুবিপুল বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দেশে তৎকালে বিশেষ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুতরাং পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি কোনও সাহায্য পান নাই। "বিলাতী" নামধেয় সকল জিনিসের সর্ব্ববিষয়ে সুনিশ্চিৎ উৎকর্ষ এবং স্বদেশীয় তাবৎ পদার্থেরই অপকর্ষ—আপনাকে ছোট করিয়া দেখার এই দীন মনোবৃত্তি জনসাধারণের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তা'ছাড়া, এদেশে বিলাতী ঔষধের ব্যবসায় যাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত, তাঁহাদের

অধিকাংশই পশ্চিমা মুসলমান। দেশীয় শিল্পকে পোষণ করিবার মত স্বদেশ-প্রীতি তাঁহাদের ছিল না। তৃতীয়তঃ অল্প পুঁজি লইয়া প্রফুল্লচন্দ্রকে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু কোনও বাধাই প্রফুল্লচন্দ্রকে নিরুদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ করিতে পারে নাই। তিনি পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করিলেন। বাজার হইতে শিশি বোতল কিনিয়া, ঔষধ ভর্ত্তি করিয়া, লেবেল আঁটিয়া তিনি ঔষধগুলি বিক্রয়ার্থ দালাল দ্বারা বাজারে পাঠাইতে লাগিলেন। এদেশে প্রস্তুত বিলাতী ঔষধ!—ব্যবসায়ীদের নিকট ইহা একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। মাল বাজারে বিশেষ ধরিল না। এই সময় তাঁহার এক পূরাতন সতীর্থ আসিয়া তাঁহার সহিত এই কার্য্যে যোগদান করেন। ইঁহার নাম ডাঃ অমূল্যচরণ বসু। ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহার সাহায্য তাঁহাদের কারখানায় প্রস্তুত ঔষধ কাটতির পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। তিনি সমসাময়িক চিকিৎসকদিগের নিকট এই কারখানায় প্রস্তুত ঔষধের অনুকূলে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় অনেকে তাঁহাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই সকল ঔষধের বিশেষ ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। ক্রমে তৎকালীন বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ট পাল এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহাদের খরিদ্দার হইলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর প্রস্তাব ক্রমে দেশীয় ভেষজ হইতে তরল সার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশীয় ভেষজের রোগ প্রতিরোধক শক্তি সম্পর্কে তৎকালীন চিকিৎসকেরা বিশেষ আস্থাবান থাকিলেও এলোপ্যাথি চিকিৎসায় তাহার কোন প্রচলন ছিল না। তখন হইতে ডাক্তারেরা এই সকল ঔষধের ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন

এবং তাহার ফলও বিশেষ সন্তোষজনক হইল। ঐ সময় এ দেশীয় ডাক্তারদিগের চেষ্টায় এদেশের ভেষজজাত অনেক ঔষধ বিলাতী ঔষধের তালিকায় (British Pharmacopœia) স্থানলাভ করিয়াছিল। অশ্বগন্ধা, বাসক, কালমেঘ, কুরচি প্রভৃতি বহু দেশীয় ভেষজের তরল সারে আজ বাজার ছাইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রই ইহাদের আদি প্রবর্ত্তক ছিলেন।

এই কারখানাটিকে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে অপরিসীম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এখানেও আনন্দ তাঁহাকে কর্ম্মশক্তি যোগাইয়াছে—আনন্দই তাঁহার রোগজীর্ণ দেহকে এই সুপ্রচুর কাজের মধ্যেও অবসাদশূন্য ও সুস্থ রাখিয়াছিল। কলেজ লেবরেটরী হইতে ফার্ম্মেসীর লেবরেটরীতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে বিশ্রামের মতই ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নূতন কাজে প্রবৃত্ত হইতেন এবং অপরাহ্ন ৪॥ টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত খাটিয়া কাজ শেষ করিতেন। কাজের সঙ্গে আনন্দ থাকিলে তাহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না।

কিছু কালের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র একজন উপযুক্ত সহকারী পাইয়াছিলেন। তিনি ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর ভগ্নীপতি। ইঁহার নাম সতীশ চন্দ্র সিংহ। সতীশ চন্দ্র রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করিয়াছিলেন। দেড় বৎসর যাবৎ তিনি পূর্ণোদ্যমে প্রফুল্লচন্দ্রকে কারখানা সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিলেন। একদিন রসায়নাগারে পরীক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে দৈবাৎ হায়ড্রোসায়ানিক বিষে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফলে, কারখানা সম্পর্কীয় সমস্ত দায়িত্ব প্রফুল্লচন্দ্রের নিজের স্কন্ধে আসিল। কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্র অবসন্ন হইলেন না। তিনি

পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময় কোন কোন দিন তাঁহাকে একাদিক্রমে ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু বড় বড় অর্ডার এবং কারখানার সম্ভাবিত বিস্তৃতির স্বপ্ন তাঁহার কর্ম্মে উৎসাহ দিন দিনই বাড়াইয়া দিতেছিল। তাই কঠোর পরিশ্রম করিয়াও কোন দিন তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে নাই। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার সতীর্থ এই কারখানার অন্যতম উদ্যোগী পুরুষ ডাঃ অমূল্য চরণ বসু প্লেগ রোগে মারা যান। ইহাতে প্রফুল্লচন্দ্র অবর্ণনীয় শোক পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র ছিলেন না। আরব্ধ কার্য্য সফলতার পথে লইয়া যাইবার দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায় তাঁহার মনকে কোনও বিপৎ-পাতেই ম্রিয়মান হইতে দেয় নাই। তিনি একাই এই কারখানার কর্ণধার রূপে ইহাকে বিরাট পরিণতির দিকে চালাইয়া লইতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে কয়েকটি শিশি বোতল লইয়া কলিকাতার একটি ছোট ঘরে আরব্ধ একটি ক্ষুদ্র কারখানা বর্ত্তমানে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক কারখানায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যারম্ভের পাঁচ বৎসরের মধ্যে উহা একটি লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত হয়। কলিকাতার ৩ মাইল দূরে ১৬ একর জমির উপর ইহার প্রথম কারখানা নির্ম্মিত হয়। পরে পাণিহাটিতে ৫০ একর জমির উপর আর একটি শাখা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীতে বর্ত্তমানে ২০০০ শ্রমিক কার্য্য করে এবং ইহার মোট সম্পত্তির মূল্য বর্ত্তমানে অর্দ্ধকোটি টাকার উপর।

Bengal Chemical and Pharmaceutical Works প্রধানতঃ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইলেও অন্যান্য বহু ব্যবসায়ের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট

ছিলেন। বস্তুতঃ, বাঙ্গালীকে ব্যবসায়মুখী করিতে, বাংলায় ব্যবসায়ের ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে তিনি তাঁহার অর্থ, সামর্থ্য ও চিন্তাশক্তি অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বিস্তার তাহার অর্থনৈতিক ও জাতীয় জীবনের একমাত্র উদ্ধারের উপায়—এই সত্য উপলব্ধি করিয়া অনেক ধনী পৃষ্ঠপোষক ব্যবসায় ও শিল্প গড়িয়া তুলিতে প্রভূত অর্থনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের বদান্যতারূপ উচ্চতর মনোবৃত্তির বিলাসেরই পরিচায়ক—যথার্থ ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। অনেক সময় প্রাথমিক বাধা বিপত্তি কাটাইয়া উঠিতে পুঁজির মোটা অংশ নিঃশেষ হইয়া যায়। ফলে ব্যবসায়ের প্রধান উদ্যোক্তাকে অসাধুতার দুর্নাম ভোগ করিতে হয় এবং পৃষ্ঠপোষকের উন্মুক্ত হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ের সাময়িক দুরবস্থা সম্পর্কে তথ্যের অনুসন্ধান লইয়া ব্যবসায়টিকে সঞ্জীবিত রাখা বা তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করার কোনরূপ আগ্রহ আর তাঁহার মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র সর্ব্বক্ষেত্রে খাঁটি ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হইতেন। ব্যবসায়ের অবনতির সহিত অসাধুতার নিত্য সম্বন্ধ—একথা তিনি মানিতেন না। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার বিশ্বাসের অসদ্ব্যবহার হইয়াছে; কিন্তু ব্যাপক ভাবে দেখিতে গেলে ব্যবসায়ের ঐতিহ্য গড়িতে হইলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রথম মুখে এরূপ আর্থিক ক্ষতি অনিবার্য্য—একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার "আত্মচরিত"-এ দু'একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—অসাধুতা ছাড়া লোকসানের অন্য সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে। ইহাদের মধ্যে "বেঙ্গল পটারিস্"-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক বাধাবিঘ্ন

অপসারণ করিতে পুঁজির একটি বৃহৎ অংশ বসিয়া গেল, এবং কারবারটী যখন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া উঠিল, তখন দেশবাসী কারবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া লোকসানী কারবারে ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিতে বিমুখ হইয়া পড়িল। এইভাবে বহু ব্যবসায় তাহার লাভের মুখে অবাঙ্গালীর হস্তগত হইয়া পড়িতেছে; আর বাঙ্গালী সেই ব্যবসায়কে গড়িয়া তুলিবার জন্য অপরিসীম যত্ন, চেষ্টা ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া ব্যর্থতার বেদনা লইয়া, আত্মবিশ্বাস হারাইয়া, শুষ্ক মুখে ও রিক্ত হস্তে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার মোহগ্রস্ত বাঙ্গালী যুবকদের বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া তিনি এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, অবাঙ্গালীর দ্বারা বাংলার শোষণের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীর ব্যবসায় ও জাতীয় শিল্প কেমন করিয়া ধীরে ধীরে শ্রমবিমুখ বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইতেছে, কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার জীবিকা হইতে বিচ্যুত হইতেছে, বাংলার শত বৎসরের ব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তিনি বাঙ্গালীকে তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যে কোন যুবক কেরাণীবৃত্তি বা ওকালতি প্রভৃতি তাহার চিরাভ্যস্ত জীবিকার পথ ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনানুসারে অর্থ বা পরামর্শ দ্বারা তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন। বেঙ্গল পটারিজ, বেঙ্গল মিস্লেনি, বেঙ্গল ট্যানারি, খাদি প্রতিষ্ঠান, প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিলস, আর্য্যস্থান

ইনসিওরেন্স কোং, বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স—এরূপ বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছে। কত বাঙ্গালী যুবক তাঁহার চিন্তাধারায় পরিচালিত, এবং তাঁহার উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে যেন পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছিল। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আজ সভয়ে দেখিতেছে—ভূমি হইতে সে বিচ্ছিন্ন, তাহার পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি—গাঁতিদারী, তালুকদারী প্রভৃতির ভিত্তি যুগধর্ম্ম প্রভাবে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশা জনবহুল হইয়া উঠিতেছে এবং চাকরির ক্ষেত্রে অবাঙ্গালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিনদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। আর তাহার অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য, দরদ ও ভাবশীলতা দিয়া বহু যুগ ধরিয়া গড়িয়া তোলা সংস্কৃতির মনোহর সৌধ ধূলায় ধ্বসিয়া পড়িতেছে। তাহার ক্ষীয়মান জীবনী শক্তি তাহাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই ধ্বংস হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি ? প্রফুল্লচন্দ্রই অক্লান্তভাবে তাহা বাঙ্গালীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। নিজের কর্ম্মজীবন দিয়া বাঙ্গালীর মনে আদর্শের প্রেরণা জাগাইতে চাহিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর বিলাসী, বিভ্রান্ত, পৌরুষহীন, জীবনভঙ্গীকে উৎসাহে, অধ্যবসায়ে এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র সারা বিশ্বের, জনসেবক প্রফুল্লচন্দ্র সমস্ত মানুষের, (কারণ, সেবাধর্ম্মের পশ্চাতে রহিয়াছে একটা চিরন্তন, সার্ব্বজনীন, দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আদর্শের প্রেরণা); কিন্তু ব্যবসায়ী প্রফুল্লচন্দ্র কেবল বাঙ্গালীরই। বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রকে বুঝিতে পারে, জনসেবক প্রফুল্লচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আরাম প্রিয়তার

অনুকূল বৃত্ত্যন্বেষী শ্রমবিমুখ বাঙ্গালী 'ব্যবসায়ী প্রফুল্লচন্দ্রকে' যেন ঠিক মত বুঝিতে চাহে না। অথচ বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ের বাণী শুনাইতে যাইয়াই এই ভারতীয় নেতা সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রসরতর ক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে চিরদিন বাঙ্গালী হইয়াই বাঁচিয়া রহিলেন। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশো ফরাসীজাতির ভাবলোকে বিপ্লব আনিয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রও বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালীর জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ যুগমানবের ন্যায় বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্খা ও বৃহত্তর সম্ভাবনার প্রতীক রূপে প্রফুল্লচন্দ্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে ব্যবসায় সম্পর্কে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা যে আত্মবিকাশের পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহার পশ্চাতে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাবই যে ক্রিয়াশীল—একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

স্বদেশ প্রেমিক ও সমাজ সেবক প্রফুল্লচন্দ্র

এইবার আমরা স্বদেশ প্রেমিক ও দরিদ্রবন্ধু প্রফুল্লচন্দ্রকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মহাপুরুষদিগের চরিত্র আলোচনা করিবার সুফল এই যে, মহৎ চরিত্র ও বিস্তৃত মনের কথা চিন্তা করিতে করিতে আমাদের মনও তদাকার প্রাপ্ত হয় এবং মানবজীবনের মহত্তর ও বিস্তৃততর সম্ভাবনা অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও আমরা অনুভব করিতে পারি। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিগত মনের মধ্য দিয়া বিরাট মানব মনের ঐক্যের সূত্র প্রসারিত, সেইজন্য কুঁচকানো আড়ষ্ট মন মহাপুরুষদিগের চরিত্র অনুধ্যান করিতে করিতে একটা সুখকর প্রসারতা অনুভব করে এবং

সেই মনের অধিকারী মানুষটি নিজের অজ্ঞাতেই জীবনের কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠে।

প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মনের গঠন আমাদের লক্ষ্যীভূত হইয়া উঠে এবং যে বংশ-গত বৈশিষ্ট্য ও অনুকূল পরিবেশের সম্মিলনে সেই মনের গঠন সম্ভব হইয়াছিল, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। মানবমনের গহন গুহায় কোথায় কোন্ গুণ সুপ্ত হইয়া আছে এবং প্রকৃতির কোন্ অজ্ঞাত হস্ত-স্পর্শে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রফুল্লকমলের সহস্রদলবিকাশের পরিপূর্ণ সুষমায় উহারা জাগিয়া উঠিতে থাকে—তাহা মানুষ দেখিতে পায় না। কিন্তু এই বিচিত্র বিকাশের কথা ভাবিয়া আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হই। জগতে মহাপুরুষ হইয়াই কেহ জন্মগ্রহণ করেন না, এবং মহাপুরুষ হইবার পরই মানুষের জীবনী লেখার প্রয়োজন হয়। সুতরাং তাঁহাদের গঠনমুখী মনের বৃদ্ধির অনুকূলে ঘটনা পরম্পরার প্রভাব সম্পর্কে অল্প কথাই আমরা জানিতে পারি। যাহা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঘটে, তাহাই ভিত্তি করিয়া অনুমান সাহায্যে দৃশ্যমান চরিত্রের অনুগত একটা যুক্তির বনিয়াদ আমরা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি।

উদার পিতার সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র—তাঁহার সংস্কার-প্রয়াসী চিত্ত প্রাচীন সংস্কারের নিগড় কাটিয়া, স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সংকল্প করিয়া তেজস্বী ব্যক্তিত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনে যত্নপর হইতেন। বালক প্রফুল্লচন্দ্র দুঃস্থ প্রতিবেশীর বাড়ীতে মায়ের ভাণ্ডার হইতে সাগু ও মিছরী বহিয়া লইয়া যাইতেন। পিতার সাহচর্য্যে সংস্কৃতির উদার মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার বালক মন বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কৈশোরে আলবার্ট স্কুলের শিক্ষকদিগের প্রভাব এবং উন্নত শ্রেণীর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রগতিশীল

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদি অধ্যয়নের ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার মত মনের গঠন তাঁহার হইয়াছিল। অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য প্রভৃতি সামাজিক রীতি সম্পর্কে একটা ঘৃণার, এবং সামাজিক দুর্গতদিগের সম্পর্কে একটি গভীর সহানুভূতির মনোভাব তাঁহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন কালে তিনি ইংলণ্ডের ভারত সম্পর্কীয় রাষ্ট্রনীতির নিরঙ্কুশ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর সিনিয়র গ্রেডে অধ্যাপকের পদ লাভের আশায় ইংলণ্ডে ও ভারতে তাঁহাকে উমেদারী করিতে হইয়াছিল। কিন্তু উপরওয়ালাদিগের পক্ষপাতমূলক নীতির ফলে যোগ্যতা সত্ত্বেও প্রথমে তিনি উক্ত পদ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই ব্যক্তিগত অসফলতার মধ্যে জাতির অসহায়তার ব্যাপক প্রতিচ্ছবি তিনি বোধ হয় দেখিতে পাইয়াছিলেন। মহৎ অন্তঃকরণের স্বভাবই এইরূপ। অজ্ঞাত কুটিরে অবহেলায় জ্বলা প্রদীপ যেমন ক্ষেত্র বিশেষে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে, তেমনি ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে উপচিত বেদনা মহৎ মনের স্পর্শে জাতির বৃহত্তর পটভূমিকায় সার্ব্বজনীন বেদনায় রূপায়িত হইয়া উঠে এবং ব্যক্তিও তখন নিজের পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া জাতির ব্যাপক সত্তার সহিত একাকার হইয়া যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বিরাট চিত্ত দিয়া জাতির সমুদয় অঙ্গকে যেন স্পর্শ করিয়া ছিলেন। তাই জাতির যে অঙ্গ যখনি অভাবে, দৈন্যে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বেদনাতুর হইয়াছে, তখনি তাঁহার চিত্তও সমানুভূতিতে ক্লিষ্ট হইয়াছে। সামাজিক রীতিনীতির ফলে জাতির অঙ্গ যেখানে দুর্ব্বল এবং পঙ্গু, তাঁহার মমতাভরা অন্তর একমুখী হইয়া সেই দিকেই ছুটিয়া গিয়াছে, এবং স্বাধিকার প্রবুদ্ধ মনুষ্যত্বের সঞ্জীবতায় তাহাকে সবল

করিয়া তুলিবার জন্য তাহার পরম আকুলতা কখনও সমাজকে কশাঘাতে, কখনও বা সমাজ নির্য্যাতিত সম্প্রদায়কে উৎসাহদানে সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জাতির ব্যাপক দুর্গতি তাঁহার অন্তরকে ব্যাপক ভাবেই নাড়া দিয়াছিল। তাহার বিপথচালিত মনকে ভ্রান্তি দর্শাইয়া কল্যাণমুখী করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মুক্তি আন্দোলনের ভাবের বন্যায় জাতির হৃদয় যখন উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গাভিঘাত তাঁহার চিত্তেও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ঋষির উচ্ছ্বসিত অন্তর ও কঠোর সংযমের কথা জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। ভাবের আলোড়ন ভেদ করিয়া একটি মাত্র বাক্য আমরা তাঁহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে শুনিয়াছি—"Science can wait, but Swaraj can not." সত্যই প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ের বিস্তৃতি জাতীয় চিত্তের বিশালত্বের সহিত উপমেয়।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০১ সালে গান্ধীজী প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। গান্ধীজীর চুম্বকধর্ম্মী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই আকর্ষণ পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। এই সাক্ষাৎকারের ফলে প্রফুল্লচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। গান্ধীজীর মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র বুঝি নিজের জীবনেরই স্পষ্টতর প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, তাঁহার সত্যপ্রিয়তা তাঁহার নিরাভরণ নগ্ন মনুষ্যত্ব বুঝি প্রফুল্লচন্দ্রের মহৎ জীবনকে মহত্তর সার্থকতার পথে আগাইয়া দিয়াছিল।

কোন বৈদেশিক সাংবাদিক বলিয়াছেন—'প্রফুল্লচন্দ্র ভাবাবেগ-

প্রধান প্রকৃতির লোক ছিলেন।' তাঁহার সকল কর্ম্মের ধারা উচ্চ ভাবলোক হইতে প্রবাহিত হইত; ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের অতীত আদর্শ নিষ্ঠা সকল কার্য্যে তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিত। বাঙ্গালী জীবনের ব্যাপক দৈন্য তাঁহার হৃদয়ে যে ক্ষোভ ও বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার বৈজ্ঞানিক সাধনা, ব্যবসায় ও শিল্প সংগঠন সকলই সেই ক্ষোভ ও বেদনার প্রতিক্রিয়ার বাস্তব রূপ।

ভাবাবেগ বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষ ধর্ম্ম। যখনই কোন বাহিরের ব্যাপার তাহার ভাবলোকে কম্পন জাগাইয়াছে, তখনই তাহার সমস্ত চেতনা বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই উদ্দীপনার মুখে বাঙ্গালী তাহার আদর্শের পায়ে জীবনের সব কিছু প্রিয় বস্তু অকাতরে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আকস্মিক উত্তেজনার অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাহার সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা শীঘ্রই তাহার শান্ত ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সঙ্কীর্ণ খাতে যেন ঝিমাইয়া পড়ে। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র আকস্মিক উত্তেজনায় আপন কর্ম্ম শক্তিকে ব্যয়িত হইতে দেন নাই। তাঁহার বৈজ্ঞানিকের হিসাবী বুদ্ধি ও পরিমাণ বোধ সর্ব্বদাই তাঁহার ভাবের মুখে রাশ কষিয়া রাখিয়াছে এবং সংযত ভাবধারা অন্তরে অহর্নিশ ক্রিয়াশীল থাকিয়া ধারাবাহিক কল্যাণ প্রচেষ্টায় নিরন্তর আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে। আকস্মিক বৈরাগ্য একদিনেই তাঁহাকে পথের ভিখারী সাজায় নাই, কিন্তু একটা অবিচ্ছেদী বৈরাগ্যের সুর তাঁহার জীবনকে দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত যেন ছাইয়া রাখিয়া ছিল এবং তাহারই তন্ময়তায় তিলে তিলে তিনি বুঝি আপনাকে চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে জাতির কল্যাণ সাধনায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সাধারণ ভাবে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন জাতির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত হইলেও, প্রত্যক্ষতঃ দুঃস্থের সেবায় এবং জাতির মঙ্গলানুষ্ঠানে তাঁহার জীবনের যে অংশটুকু ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহাকে চারিভাগে ভাগ করা যায়—১। খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তর বঙ্গের বন্যা, ২। খদ্দর প্রচার ও চরকা প্রচলন, ৩। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, ৪। বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত জাতিকে সুপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তাঁহার অসংখ্য রচনা ও বক্তৃতাদান। এই সমস্ত কার্য্য তাঁহার তীক্ষ্ণানুভূতিশীল মনেরই বহিঃ প্রকাশ। কিন্তু এই কার্য্যগুলির দ্বারা তাঁহার অসামান্য কার্য্যকুশলতা ও সংগঠন শক্তির পরিমাপ হইলেও, উহার দ্বারা তাঁহার বিরাট আবেগশীল মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভের পরিমাপ কখনই সম্ভব নহে। তাঁহার ব্যক্তিগত আচরণ, পত্র ও উচ্ছ্বাসের মুখে উচ্চারিত বক্তৃতায় সময় সময় তাহা আংশিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৯২১ সালের খুলনার দুর্ভিক্ষের পর হইতে প্রফুল্লচন্দ্র একান্তভাবে "সাধারণের সম্পত্তি" হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি অশিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা প্রচারের মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজ্ঞানতা ও শিক্ষার অভাব যে জাতীয় উন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়—ইহা তিনি জীবন-প্রারম্ভেই অনুভব করিয়াছিলেন; সেই জন্য দেশের বুকে জ্ঞানের আলো জ্বালিবার জন্য তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ দান করিয়া গিয়াছেন। অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র তাঁহারই অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার স্বগ্রাম রাড়ুলির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বাগেরহাট কলেজ এবং খুলনার অন্তর্গত সাঁইহাটি ও বুধহাটার উচ্চ

ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহার সাহায্য-পুষ্ট। সারা ভারতের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাঁহার অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছে।

৯। দুর্ভিক্ষ ও বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে তাঁহার সেবা

অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণীবাত্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রার প্রায় নিত্যসঙ্গী। বাঙ্গালার কোন না কোন অঞ্চল প্রায়ই ইহাদের নিষ্ঠুর আক্রমণে উপদ্রুত হইয়া থাকে। মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইহাদের প্রতিরোধে কোন দিনই নিয়োজিত হয় নাই। উৎপীড়িতের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানও দেশে গড়িয়া উঠে নাই। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যখন আসে—দেশের অসহায়, নিরক্ষর, মূর্খ, মূক জন সাধারণ ভগবানের দেওয়া শাস্তি অথবা ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস মনে করিয়া নীরবে তাহা মানিয়া লয়।

বিজ্ঞান কলেজের প্রাচীরের অন্তরালে সাধনানিরত ধ্যানমগ্ন এই বৈজ্ঞানিক একদিন আকস্মিক ভাবেই দেশবাসীর এই নিদারুণ দুর্দ্দৈবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ১৯২১ সালের গ্রীষ্মকাল। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার চিরাচরিত প্রথামত গ্রীষ্মাবকাশে তাঁহার প্রিয় পল্লী রাড়ুলী আসিয়াছেন। পরপর দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁহার স্বগ্রাম রাড়ুলির নিকটবর্ত্তী বিল অঞ্চল সমূহে এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র দূর হইতে এই দুর্ভিক্ষের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থার ভয়াবহতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

খুলনায় আসিয়া তিনি দেখিলেন—দেশের বুকে দীর্ঘ পাণ্ডুর ছায়া

ফেলিয়া দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে—সহস্র সহস্র অনশন ক্লিষ্ট বুভুক্ষু নরনারী—আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়া তাহাদের চোখে মুখে—চামড়ায় ঢাকা চলমান কঙ্কাল শ্রেণী ; যাহাদের লাঙ্গলের মুখে ধান্যরূপিনী লক্ষ্মী হরিতের সমারোহে আবির্ভূতা হন, তাহারাই আজ অন্নের কাঙ্গাল—কাতর দৃষ্টিতে ভিক্ষুকের মিনতি জানাইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! এই মর্ম্মন্তুদ বেদনার দৃশ্য তাঁহার প্রাণকেন্দ্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিল, তাহারই ফলে তাঁহার মানবহিতৈষণার অন্তর্গূঢ় স্রোতো-ধারা যেন সংযমের পাষাণ ভেদ করিয়া জনকল্যাণের সহস্রধারায় বাহিরে উৎসারিত হইল। প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান সাধনার উচ্চ মানসিক স্তর হইতে নামিয়া আসিলেন মাটির পৃথিবীতে—অনাহার,মহামারী, অত্যাচার ও অবিচারে দেশের বুক যেখানে বেদনায় মথিত হইতেছে।

এই দুর্ভিক্ষে রাজসরকার ঔদাসীন্য ও অবহেলাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'খালবিলে প্রচুর মাছ মিলে, দুধ জলের দরে বিকাইতেছে,' অর্থাৎ এই রূপ প্রাচুর্য্যের অবস্থা মোটেই দুর্ভিক্ষের অনুকূল নহে—রাজ কর্ম্মচারী এই মন্তব্য করিয়া দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। অবশ্য রাজকর্ম্মচারীকে আমরা অপরাধী করিব না। জনসাধারণের জীবনের স্বাভাবিক মান ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা—এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান এত ক্ষীণ যে, দুর্ভিক্ষের অবস্থার গুরুত্ব এই বিদেশী রাজকর্ম্মচারী অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রাচুর্য্যের কোলে আসীন বিদেশী রাজকর্ম্মচারীর নিকট—জনসাধারণের স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদের অবস্থা অনুভব করিবার মত মনের বিস্তৃতি আমরা আশা করিতে পারি না ; বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্ট যেখানে জনসাধারণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

প্রফুল্লচন্দ্র দেশবাসীর এই দুর্দ্দশা মোচনের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে দেশবাসীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এইখানে আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রভাব লক্ষ্য করি। তাঁহার আবেদনে দেশবাসী অপ্রত্যাশিত ভাবে সাড়া দিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অর্থ ও বস্ত্র সংগৃহীত হইল। মহাত্মা গান্ধী আর্ত্ত দেশবাসীর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রকে পত্র দিলেন। তাঁহার আহ্বানে ধনী মাড়োয়ারী সম্প্রদায় প্রভূত সাহায্য করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে বস্ত্রে ও নগদ টাকায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। খুলনার লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও কুঞ্জলাল ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় দেশপ্রেমিক স্বদেশসেবক এই দুঃস্থের সেবা-কার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। বরিশাল হইতেও বহু যুবক আসিয়া "ক্ষুধিতের অন্নদান" সেবার মহান্ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইলেন। প্রফুল্লচন্দ্র যাহার উদ্যোক্তা, তাহার যৌক্তিকতায় সন্দেহ করিতে দেশবাসী কোন দিন শিখে নাই। দেশবাসীর কি বিপুল আস্থাই না প্রফুল্লচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন!

১৯২২ সালে ভীষণ প্লাবনের ফলে উত্তরবঙ্গে চরম দুর্দ্দশা দেখা দেয়। বৈদেশিক সাংবাদিকদিগের হিসাব মত ক্ষতির বিবরণ এইরূপ :—

"বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের আয়তন প্রায় দুই হাজার বর্গমাইল, লোক সংখ্যা দশলক্ষেরও অধিক। ঘনবসতিপূর্ণ প্রায় ৭০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের অর্দ্ধেকের বেশী গৃহই ধ্বংস হইয়াছে, গবাদি পশুর সমুদয় খাদ্য নষ্ট হইয়াছে। অন্ততঃ পক্ষে ১২ হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হইয়াছে ৫০০ বর্গমাইল স্থানের ধানের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

দেশের এই নিদারুণ দুর্দ্দিনে দেশবাসী পরম নির্ভরতায় প্রফুল্ল-

চন্দ্রকে আঁকড়াইয়া ধরিল। খুলনা রিলিফের কার্য্য সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। এইবার ক্ষেত্র ব্যাপকতর, দেশবাসীর প্রয়োজনও বহুমুখী ; কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মশক্তিও অসাধারণ। গৃহহীন মুমূর্ষু দুর্গতদিগের আর্ত্ত ক্রন্দন প্রফুল্লচন্দ্রের কণ্ঠেই যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাঁহার আহ্বানে সমবেদনার আবেগে কোটিপ্রাণ যেন একটি প্রাণের মতই সাড়া দিল। একমাসেরই মধ্যে তিন লক্ষ টাকা উঠিল। স্ত্রীলোকেরা গাত্রের অলঙ্কার, পরিধেয় বস্ত্রাদি দান করিতে লাগিলেন। বন্যাপীড়িতের সাহায্যকল্পে স্থানে স্থানে যে সকল সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, "বেঙ্গল রিলিফ কমিটি" নামে একটি কেন্দ্রীয় সেবা প্রতিষ্ঠানের অধীনে তাহাদের সকলকে সংযুক্ত করিয়া একটি দেশব্যাপী বিরাট সেবা-সংগঠন গড়িয়া তুলিলেন এবং বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ও অব্যবস্থিত আহার্য্যের পরিবর্ত্তে কেন্দ্র হইতে উৎসারিত সুনিয়ন্ত্রিত সাহায্য দুর্গতদিগের মধ্যে নিয়মিত ভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই সেবা-প্রতিষ্ঠানের অফিস ও গুদামের জন্য বিজ্ঞান কলেজের একাংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সুভাষচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি মহাপ্রাণদিগের চেষ্টায় এবং শত শত উদার চরিত্র যুবকের কার্য্যের দ্বারা দুর্গতদিগের সমস্ত প্রকার অভাব শীঘ্রই বিদূরিত হইল।

প্রফুল্লচন্দ্র এই সেবাকার্য্যের জন্য তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে গৌরবভাগী করিয়াছেন। সত্যই সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত এবং অন্যান্য সংগঠন-শক্তিসম্পন্ন ও একনিষ্ঠ জনকল্যাণকামীর অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে এইরূপ সুশৃঙ্খল ও কর্ম্মতৎপর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছিল। তবে একথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে—প্রফুল্লচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই এই প্রতিষ্ঠান রূপায়িত হইয়াছিল

এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রে রাখিয়াই এই সেবা-প্রতিষ্ঠানের চাকাটী আবর্ত্তিত হইতেছিল।

পুনরায় ১৯৩১ সালে ভীষণ বন্যা ও ঘুর্ণীবাত্যায় পূর্ব্ববঙ্গের অনেকগুলি জনপদ বিধ্বস্ত হইল। যে দেশে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় লাগিয়াই আছে, সরকার যেখানে জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশায় একান্ত উদাসীন, সেখানে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য দেশবাসীকেই অগ্রসর হইতে হইবে। দেশবাসীর এই দুর্দ্দিনে জনসেবা প্রণোদিত হইয়া বাংলায় 'সংকট-ত্রাণ সমিতি' নামে একটি স্থায়ী সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাহার পরিচালক হইলেন। দেশের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না, তাহা হইলেও প্রফুল্লচন্দ্রের আবেদনে দেশবাসী যথাসাধ্য সাহায্য করিল। দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আর্ত্তের সেবায় প্রফুল্লচন্দ্রকে দান করিয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ-উপদ্রুত অঞ্চল ভ্রমণ করিতে যাইয়া, জনসাধারণের বিশেষতঃ চাষীশ্রেণীর (ইহারাই দুর্ভিক্ষের ফলে সর্ব্বাধিক বিপন্ন হইয়াছিল) জীবন যাত্রার সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। চরম দুঃখদুর্দ্দশায় দেশবাসী তাহার সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়াছে সত্য ; কিন্তু নিত্য উপবাসীকে কে দেখিবে ? ইংরাজ আমলে দেশে যতবারই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তাহাকে অন্নাভাব না বলিয়া অন্নের মহার্ঘতা বলাই সঙ্গত হইবে। নিজ জমিতে অজন্মা এবং দুর্ম্মূল্য খাদ্য-ক্রয়োপযোগী অর্থের অস্বচ্ছলতা—এই উভয় কারণের যুগপদ বিদ্যমানতার ফলে প্রত্যেক বারই বাংলায় বিপুল-প্রসার লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ সম্ভব হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র সোদ্বেগে লক্ষ্য করিয়াছিলেন ভাগ্যের অবশ্য-

ভাবিতায় বিশ্বাসের ফলেই হউক, অথবা অশিক্ষাজনিত মানসিক উৎকর্ষের অভাবেই হউক, আমাদের দেশের চাষীদের মনের উদ্ভাবনী বৃত্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাদের এক মাত্র জীবনোপায়, চাষের পরিপূরক কোন সংগঠিত কুটীর শিল্প তাহাদের ভিতর প্রচলিত নাই, যাহা অজন্মার দুর্দ্দিনে অনটন হইতে তাহাদের রক্ষা করিতে না পারিলেও, অনাহার অক্টোপাসের বজ্র আবেষ্টনে নিষ্পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতন হইতে অন্ততঃ তাহাদের রক্ষা করিতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যক্ষ-লব্ধ অভিজ্ঞতা দুর্ভিক্ষ-জনিত কষ্টের আশু প্রতীকারে তাঁহাকে যেমন সচেষ্ট করিয়াছিল, তেমনি ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের প্রতিরোধ কল্পে এবং কৃষক জনসাধারণের জীবনের অর্থ নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহাকে উদ্যোগী করিয়াছিল। খুলনা দুর্ভিক্ষের জন্য বুধহাটা, আশাশুনি, মিত্রতেঁতুলিয়া, প্রতাপনগর, খুলনা সদর, কাটিপাড়া, খেশরায় যে সমস্ত সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়, সেখানে সুতাকাটা, কাপড়বোনা, বেত ও বাঁশের নানা প্রকারের জিনিষ তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রের যে জাতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই সকল শিল্প সঞ্জীবিত থাকিয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, তাহার অভাবে শিল্পগুলি প্রসার লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু ইহারা সেই চরম দুর্দ্দিনে জনসাধারণের পরম নির্ভরস্থল হইয়াছিল। এই উপলক্ষে চরকা, ও খদ্দর প্রফুল্লচন্দ্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

চরকা ও খদ্দর

বর্ত্তমান যুগে যন্ত্রচালিত মোটর গাড়ী, মোটর বাইক, ও ট্রামের গমনাগমনের মাঝখানে ঝিমাইয়া চলা গোযান যেমন আমাদের নিকট

বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু ঠেকে, তেমনি গোযান সভ্যতার সমসাময়িক এই চরকা আজ বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতার পটভূমিকায় নিতান্ত বেমানান ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। যে সময়ের মধ্যে কারখানার বিরাট গর্ভ হইতে হাজার হাজার গজ সুতা বাহির হইয়া আসিতেছে, সেই একই সময়ে গৃহের কোণে হস্তচালিত চরকা "ঘ্যানোর ঘ্যানোর" শব্দে 'পারিনে পারিনে' করিতে করিতে এক শত গজ সুতা পাকাইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে বসিয়া আধুনিকতম ভাবের আলোকে জাতীয় জীবনের সমস্যা আলোচনা করিতে যাইয়া—চরকা এযুগে অচল—এ ধারণা নিঃসন্দেহে আমাদের মনে জাগিতে পারে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রও একদিন চরকার প্রতিকূলেই মত পোষণ করিয়াছিলেন।

আমরা ভুলিয়া যাই—আমাদের জাতীয় জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রায় গোযান সভ্যতার সমসাময়িক রহিয়া গিয়াছে। আজও আমাদের স্বদেশী যান গো-শকট ও নৌকা, হাজার বছর আগেও যা' আমাদের ছিল। এখনও বটতলার কুঁড়ে ঘরে আমাদের গ্রাম্যকর্ম্মকার নেহাইএর উপর হাতুড়ি পিটাইয়া লোহা বাঁকাইয়া আমাদের কাটারি, কুড়ালি, খোন্তা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া দেয়। হাজার বছর আগের লাঙ্গল চাষীর হাতে আজও অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে যাহাই আমরা ব্যবহার করি, আমরা তাহার ক্রেতা—নির্ম্মাতা বা বিক্রেতা নহি; শুধু তাহাই নহে, কার্য্যতঃ, তাহা নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের অধিকার আমাদের নাই। গত ৩।৪ শত বৎসর ধরিয়া পশ্চিমের মহাদেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবর্ত্তনের ফলে তাহাদের জাতীয় জীবনে যে নূতন নূতন সত্য রূপায়িত হইয়াছে, তাহা তাহাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের

পরিণতি পথে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা আমাদের দেশের কতিপয় উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীলের মননশীলতায় ধরা পড়িলেও, আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাণময় স্বতঃ-স্ফুর্ত্ত সত্যরূপে তাহা ফুটিয়া উঠে নাই। জাতির মন্থর-গতি জীবন ধারার সহিত যাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, সমস্যার সমাধান করিতে হইলে তাঁহাকে জাতির অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে যে সকল সংস্কার, তাহাদিগকে যুগোপযোগী নূতন-রূপে পুনর্জীবিত করিয়া সংহত চেষ্টাদ্বারা তাহাদিগকেই সার্থক করিয়া তুলিতে হয়। তাই মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে অহিংসার বাণী শুনাইলেন, দেশবাসীর ঘরে ঘরে চরকা ও খদ্দরের বাণী প্রচার করিলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িতের চরম দৈন্যের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চরকার সত্যরূপ প্রফুল্লচন্দ্রের চক্ষেও প্রকট হইয়া উঠিল। দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির একটি প্রধান অবলম্বন রূপে চরকা ও খদ্দরের বাণী প্রচারের মহৎ ব্রত তিনি জীবনে বরণ করিয়া লইলেন।

১৯২১ সালে শুঁড়া সেবাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, যখন মহাত্মা গান্ধী চরকার বাণী প্রচার করিলেন, তিনি ইহার কার্য্যকারিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খুলনা দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, চরকাই এই সকল দুঃস্থ নরনারীর দুঃখমুক্তির একমাত্র উপায়। ঐ বৎসরই খুলনা রিলিফ কমিটির সমক্ষে চরকা ও তাঁতের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন"দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মধ্যে চরকা ও তাঁত প্রচলন করা হইলে তাহাদের যথার্থ স্থায়ী উপকার করা হইবে। দেড় বৎসর যাবৎ চরকার বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বঙ্গের প্রায় বার আনা লোক অধিকাংশ সময় আলস্যে

কাটায় ; তাহাদের পক্ষে চরকা সঞ্জীবনী সুধা-স্বরূপ। যে কোন লোক অবসর সময়ে চরকা কাটিয়া মাসিক দুই টাকা আয় করিতে পারে। ফলে চরকা আমাদের মহোপকারী জিনিষ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত মহাত্মা গান্ধীর গভীর বন্ধুত্বের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার "আত্মচরিতে" একস্থানে বলিয়াছেন—কৌপীনধারী মহাত্মা গান্ধী আমার শ্রদ্ধার পাত্র। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্ব চরকা ও খদ্দর প্রচার সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল। ১৯২২ সালের ১৫ই জানুয়ারী বোম্বাই নগরীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আহ্বানে "মালবীয়া কনফারেন্স" নামক যে বৈঠক বসিয়াছিল, উহাতে প্রফুল্লচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় তিনি গান্ধীজীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি দেশে চরকা ও খদ্দর প্রচলনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। অসাধারণ সংগঠন শক্তি ও গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে মনের বিশেষ আকর্ষণ—চরিত্রে এই দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে খদ্দর ও চরকা প্রচারে সেদিন বাংলাদেশে প্রফুল্লচন্দ্রই বোধ হয় যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন। গান্ধীজীকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি সাধ্যাতীতভাবেই তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই মিলনের পূর্ব্ব হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র চরকার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ-উপদ্রুত অঞ্চলের স্থানে স্থানে তিনি কাটুনি সংঘ গড়িয়া তুলেন। এখন হইতে তাঁহার কর্ম্মধারা নূতন গতিবেগ লাভ করিল। খুলনার বিভিন্ন পল্লীতে নিঃস্বার্থ কর্ম্মীদলের পরিচালনায় কাটুনি সংঘ গঠিত হইল। সুতা সংগ্রহ ও খদ্দর প্রচারের জন্য কর্ম্মকেন্দ্র খোলা

হইল। তাঁহার উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও অর্থসাহায্যে বাংলার দুইজন কৃতী সন্তান প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, শ্রীনগর, সিরাজদিয়া প্রভৃতি থানায় চরকা প্রচলন দ্বারা শুদ্ধ খাদি উৎপাদনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্তের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে আত্রাইতে একটি বিশাল খাদি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। বিভিন্ন স্থানে খাদি প্রদর্শনী ও সুতাকাটা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। নূতন উৎসাহ, নব উদ্দীপনার একটি প্রবল স্রোত জাতির উপর দিয়া প্রবাহিত হইল। পল্লীর শাখাকেন্দ্রগুলি জেলা-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে একটি কেন্দ্রীয় খাদিপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। প্রফুল্লচন্দ্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্য কল্পে "প্রফুল্লচন্দ্র রায় ট্রাষ্ট" নামে একটি ট্রাষ্ট গঠন করিয়া উহার হস্তে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন।

সেদিন সংগঠন শক্তিতে বাংলা অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিতে জানিতেন। তাই সমস্ত কেন্দ্রেই খাদি প্রচার-কার্য্য পরিচালনা-গুণে ঘড়ির কাঁটার মত চলিতে লাগিল। আর এই কার্য্যের পশ্চাতে রহিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও বিপুল অর্থ সাহায্য। তাঁহার অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ক্ষীণদেহ লইয়া তিনি যে শুধু বাংলাদেশে খদ্দরের বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাই নহে। তিনি খাদির বার্ত্তা লইয়া প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। মাদুরা, কোকনদ, উৎকল, অন্ধ্র, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে খাদির শুভ বার্ত্তা উদাত্ত-কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন।

১৯২৪ সালে কারামুক্ত হইয়া মহাত্মা গান্ধী প্রফুল্লচন্দ্রকে যে তার করেন, তাহার উত্তরে প্রফুল্লচন্দ্র অন্যান্য কথার মধ্যে এ কথা স্পষ্টই

স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যতই তিনি খদ্দর প্রচার সম্পর্কে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, চরকাই জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র উপায়—The more, however, I work in this direction, the more convinced I am becoming that in Charka lies the economic salvation of India.

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র

আমাদের চামার, জোলা, তাঁতি, নাপিতেরা আবহমানকাল হইতে সেই একঘেয়ে পৈতৃক ব্যবসায় করিয়া আসিতেছে। তাহাদের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন নাই,—আনন্দ নাই। আমাদের কতকগুলি শ্রমশিল্পী অস্পৃশ্য জাতীয়, এবং তাহারা যে ভাবে দিনের পর দিন পৈতৃক ব্যবসায় চালায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই…আমাদের মধ্যে যে চামার, সে চিরকালই চামার থাকিবে, এবং তাহার সন্তান সন্ততির সমাজে কোন কালে মর্য্যাদা লাভের সম্ভাবনা নাই—প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার "আত্মচরিত" এ এই কথা বলিয়াছেন।

অস্পৃশ্য জাতি জাতির একটি বিরাট অংশ ব্যাপিয়া অনড় অচল ভাবে ইহারা অবস্থান করিতেছে। ইহাদের জীবনের গতিপথ রুদ্ধ, মানসিক বিকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—উন্নতির সম্ভাবনা বৈচিত্র্যহীন ও সুপরিসীম। যদিই বা দুই একজন বৈচিত্র্যময় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছিটকাইয়া পড়ে, তাহারা স্বজাতীয়ের আনুগত্য স্বীকার করিতে লজ্জা ও অগৌরব অনুভব করে। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বনিয়াদের উপর তাহারা দাঁড়াইয়াছিল, দুই একটি ব্যতিক্রম

বাদে, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গবেষণার বিশুদ্ধ উপাদান হিসাবে আজও তাহারা একই স্থানে ও প্রায় একই অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। জাতির একটি প্রগতিশীল অংশ যখন পৃথিবীর দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা ও ভাবধারার সহিত আপনাকে মানাইয়া লইয়া আগাইয়া চলিবার জন্য ছটফট করিতেছে, তখন এই স্তব্ধ নিশ্চল জড়-প্রকৃতি মানুষের বিরাট দল জাতির অগ্রসর অংশটিকে দুর্নিবার আকর্ষণে পিছনে টানিয়া রাখিয়া তাহার অগ্রগামীগতিকে কেবলই মন্থর করিয়া দিতেছে।

অন্যদেশে ধানকাটা দাঁড়টানা মজুর একদিন ফাদার আব্রাহাম লিঙ্কনের গৌরবময় পদমর্য্যাদা লাভ করে। গরুর রাখাল ভূতত্ত্ববিদ হয়, মুচি ধর্ম্মপ্রচারক হয়, জুতা সেলাইকার রাষ্ট্রনায়ক হয়, ব্যাঙ্কের ঝাড়ুদার উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার পদলাভের আশা পোষণ করে। কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের দেশে শিক্ষা, মানসিক উৎকর্ষ, রুচি ও শালীনতা যাহাই হউক না কেন, মুচি মুচি থাকিয়া যায়। একজন পেরিয়ার জীবনের পরিসর কখনই বিস্তৃততর হইতে পারিবে না। ঝাড়ুদার সারা জীবন ঝাড়ু দিয়া, জীবনভোর ঝাড়ুর স্বপ্ন দেখিয়া মরিবার সময় পুত্রকে ঐ ঝাড়ুরই ওয়ারেশ রাখিয়া যাইবে। এরা যেন মক্ষি জগতের নপুংসক শ্রমিক-গোষ্ঠী—পরিশ্রমের ক্লান্তিতে এদের জীবন ঝিমাইয়া আসে, কিন্তু নব নব রসের আস্বাদনে—নব নব সৃষ্টিতে ইহাদের জীবন বৈচিত্র্যময় ও সার্থক হইয়া উঠে না।

বস্তুতঃ অস্পৃশ্যতা বুদ্ধি ও ক্ষমতার অপচয় ঘটাইয়া পরোক্ষে সমাজের যে প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে, তাহা প্রফুল্লচন্দ্রকে ব্যথিত করিয়াছিল। অস্পৃশ্যতার বিরাট অংশ ব্যাপিয়া কত সম্ভাবিত বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিক তাহার সম্ভাবনাশূন্য জীবনের গ্লানি

বহন করিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, কত সাহিত্যিক প্রতিভা অবজ্ঞা ও অবহেলার হিমবায়ু স্পর্শে শুকাইয়া গিয়াছে—তাহার সংবাদ আমরা রাখি না। কিন্তু অন্য জাতির জীবন দৃষ্টে এই ক্ষতি যে আদৌ কাল্পনিক নহে,—তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—একজন পিট আর্ল অব চ্যাথাম হইতে পারেন। সাহিত্য জগতে একজন কসাইএর পুত্র "রবিনসন ক্রুশোর" প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হন, জেলের একজন হীন ব্যবসায়ী "পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস" বই লিখিতে পারেন, কিন্তু আমাদের চামার, জোলা, তাঁতী—এরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

প্রফুল্লচন্দ্র স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া ছিলেন যে, অস্পৃশ্যতা জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। অজ্ঞ, মূর্খ, দীনতার মৌতাতে ঝিমধরা, অত্যাচার ও নিপীড়নে অবসন্ন ও স্তম্ভিত জাতীয় জীবনের এই বিরাট অংশটিকে সচল, সক্রিয় এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিতে না পারিলে, মুষ্টিমেয়ের চীৎকার, আস্ফালন ও অন্য সর্ব্বপ্রকার লঘু প্রচেষ্টা জাতির কল্যাণ সাধনে একেবারেই নিরর্থক হইবে। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতীয়তাবাদীদিগের সমাজ সম্মেলনে (Indian Nationalist Social Conference) তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—আমরা যখন এক জাতিত্বের বনিয়াদে ভারতের রাজ-নীতিক পুনর্গঠনের স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছি, তখনই জাতির বিভিন্ন স্তর ও সম্প্রদায় হইতে অনৈক্যের সুর ধ্বনিত হইতেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ওতপ্রোত জড়িত। তাই সামাজিক সমস্যা অবহেলা করিয়া রাজনীতিক সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া রাজনৈতিক প্রগতি সামজিক বাধায় ঠেকিয়া

অচল হইয়া পড়িতেছে। আজও আমাদের দেশে ‘বার রাজপুতের তের হাঁড়ী’। ৫০০ কংগ্রেস প্রতিনিধির জন্য ৫০০ রান্না ঘর দরকার হয়। ব্রাহ্মণের অগ্নিপক্ক খাদ্যে কোন নীচ জাতীয় লোক দৃষ্টি দিলে, তাহা অপবিত্র হয়। আমরা বরফ খাই, লেমনেড খাই, সমাজে কেহ বিশেষ সম্মান লাভ করিলে সব জাত মিলিয়া ভোজের সভায় আসর জমাই, অস্পৃশ্যের হাতে খাবার খাই। কিন্তু একজন অস্পৃশ্য চৌকাঠ মাড়াইলে ঘরের জল ফেলা যায়, বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমান বা নীচ জাতীয় হিন্দুর সহিত একত্র আহার করিলে, তখনই আমাদের জাতিচ্যুত করা হইবে।

অস্পৃশ্যতা মানবতার অপমান—এ সত্যও প্রফুল্লচন্দ্র দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। একটি কুকুর বিড়াল আমাদের গৃহে যে মর্য্যাদাটুকু পায়, এক জন অস্পৃশ্য মানুষ হইয়াও তাহা পায় না। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা ও বহু প্রবন্ধে এই অস্পৃশ্য জাতি সম্পর্কে তাঁহার গভীর সমবেদনা, এই নির্য্যাতিত অধঃপতিত মুক জনসাধারণের উন্নতির জন্য তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—“মানুষ মানুষকে ছোঁয় না। ইহার চেয়ে যে আর কিছু পাপ থাকিতে পারে, তাহা আমার কল্পনাতীত। ইহা অপধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কুধর্ম্ম। বিড়াল কুকুর ঘরে ঢুকিতেছে, তাহাতে দোষ হয় না; কিন্তু যদি একজন তথাকথিত অস্পৃশ্য গৃহে প্রবেশ করে অমনি হাঁড়ি ফেলিতে হইবে; যেন অস্পৃশ্যতারূপ বিষ অর্জ্জুনের শরের ন্যায় ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসীর ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল।” * তাঁহার জীবনের সর্ব্বোত্তম অন্তিম কামনা এই অধঃপতিত

---

* আচার্য্য বাণী—২য় ভাগ পৃঃ ১৩৭।

জাতিকে অবলম্বন করিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কি গভীর সমবেদনায় তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

"যখন আমার দিন ফুরিয়ে যাবে, তখন আমি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে চাইব তাদেরই মাঝে, যারা অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে চলবে সংগ্রাম করে, যতদিন না আমার নির্য্যাতিত দেশ জননীর ললাট থেকে মুছে যায় কলঙ্ক-কালিমা।"

জাতীয়তাবাদী প্রফুল্লচন্দ্র

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা রত বিজ্ঞানের সাধনায় ধ্যানমগ্ন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা দেখিয়াছি। দুর্দ্দশামগ্ন বাঙ্গালীর দুর্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা ব্যবসায়ী হইয়া উঠিতে দেখিয়াছি। সমাজের অপাংক্তেয় নিপীড়িত অস্পৃশ্য জাতির অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁহার কণ্ঠকে উদাত্ত হইয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি। আবার দুর্ভিক্ষে, জল প্লাবনে, ঘূর্ণীবাত্যায় বিপর্য্যস্ত, দুর্গত জনসাধারণের অশেষ দুর্দ্দশার মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার কল্যাণহস্তে তাহাদের সমস্ত দুঃখের গ্লানি মুছাইয়া দিতেও প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা দেখিয়াছি। আজ বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনার পূর্ণ পরিণতির ফলে আন্তর্জাতিকতার বিরাট ক্ষেত্রে মানব সমাজ যখন মিলিত হইতে চলিয়াছে, তখনও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-শূন্য, নাবালক এবং পরকল্পিত ও পরের হাতে বাঁটিয়া দেওয়া মঙ্গলের বোঝা বহিয়া পরের অভিভাবকত্বে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া মরিতেছে যে জাতি, তাহার বেদনা কি প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করে নাই? জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে প্রফুল্লচন্দ্রের স্থান তো আমরা দেখিতে পাই না! তাঁহার

জীবনের এতদ্‌সম্পর্কীয় তাৎপর্য্যটুকু বুঝিতে চেষ্টা করা—এখানে মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কেন তিনি জাতীয় আন্দোলনে সম্পূর্ণ ভাবে জড়াইয়া পড়েন নাই, তাহা তাঁহার নিজের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হইলে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার পত্নী বাসন্তী দেবীকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক খানি পত্র লিখেন। ঐ পত্রে একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার প্রিয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্য দিয়াই আমি আমার দেশের সেবা করিব। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এক। ভগবান জানেন আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।" বাংলার প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী ডাঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিতে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"৩০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ৩০ জন উপযুক্ত রাসায়নিক এখনও হয় নাই। দেশের কাজ দেশের নানা বিভাগে নানা জনের দ্বারা করিতে হইবে। তোমাদের মত প্রতিভাসম্পন্ন কৃতবিদ্য যুবকের উপর দেশের খ্যাতি নির্ভর করিতেছে।"

প্রফুল্লচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্য হইতে তাঁহার জীবনের মহত্তম আদর্শ আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। সর্ব্বদেশে জাতীয় সমৃদ্ধি বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশকে বিজ্ঞানে সমুন্নত করিয়া না তুলিলে অগ্রসর জাতিগুলির লাগাল ধরিয়া তাহাদের সহিত সমান তালে চলা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রফুল্লচন্দ্র জীবন আরম্ভ করেন। আর তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বিজ্ঞান-সাধনা। তিনি বহু জন-মঙ্গলকর কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহা

তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনাকে অব্যাহত রাখিয়া। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন? নিরঙ্কুশ তাহার দাবী—অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও নিষ্ঠুর তাহার আহ্বান। জাতির মুক্তিকামীকে তাহার প্রাত্যাহিক জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্যানে ও কর্ম্মে দেশ মাতৃকার ঐশ্বর্য্যময়ী মুর্ত্তিকে অন্তরে ফুটাইয়া তুলিতে হয় এবং জীবনের সকল কামনা—সকল প্রয়োজন তাহার পায়ে নিবেদন করিয়া একান্তভাবেই দেশেরই সেবক হইয়া উঠিতে হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে জাতির রাজনৈতিক মুক্তির প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রথম জীবনে বিজ্ঞান দেবীর নিকট তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কখনও তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

অধ্যাপকের শান্তিপূর্ণ জীবন তিনি যাপন করিয়াছিলেন। কোলাহল-মুখর সংসারের ক্ষেত্র হইতে দূরে বিজ্ঞানের সাধনায় জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি অতিবাহিত করেন। তাহার ফলে তাঁহার মনের গঠন জাতীয় আন্দোলন ও তদানুসঙ্গিক হাঙ্গামা ও গণ্ডগোলের ঝক্কি পোহাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিজে একস্থানে বলিয়াছেন—"আমি কখনও মনে করি নাই যে, আমার স্বভাব ও প্রবৃত্তিতে রাজনীতিক হইবার যোগ্যতা আছে।"

কিন্তু গঠন-মূলক কর্ম্মপন্থা চিরদিনই তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ভারতের জাতীয় মহাসভা কর্ত্তৃক বিঘোষিত গঠন মূলক কাজগুলি তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া গ্রহণ করিয়া ছিলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সাম্প্রদায়িক মিলন, এবং খদ্দর ও চরকা প্রচলন—এই তিনটি গঠনমূলক কর্ম্মপন্থাকে গান্ধীজী স্বরাজের তিনটি স্তম্ভরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। খদ্দর ও চরকা প্রচার এবং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্পর্কে

প্রফুল্লচন্দ্রের আগ্রহ, উদ্যম ও প্রচেষ্টার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র বেশী কিছু বলেন নাই। তিনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন—হিন্দু মুসলমান বিভেদ আমাদের জাতীয় জীবনে কোনদিনই স্বয়ং-ক্রিয় ছিল না। সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক কারণে উহা যেন মূলহীন গাছের মত আকস্মিকভাবে আমাদের সমাজদেহে চাপিয়া বসিয়াছে, এবং ঈর্ষ্যা অসূয়া প্রভৃতি হীনবৃত্তির রসে পুষ্ট হইয়া জাতির বুকে শিকড় ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের নিজস্ব ধারায় সর্ব্ব জাতির মিলনক্ষেত্র এই ভারতে একটি মহাজাতি সম্ভাবনার যে বিরাট ডিম্বে জন্মের প্রতীক্ষা করিতেছিল, বিভ্রান্ত নেতৃত্বের অসহিষ্ণুতা অসময়ে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই অপরিপুষ্ট মহাজাতির অঙ্গগুলিকে সম্প্রদায়গত আংশিক চেতনার ভিত্তিতে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছে। তিনি গভীর বেদনার সহিত আরও বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন—ত্যাগ উদারতা, মানসিক বিস্তৃতি, বীর্য্যবত্তা প্রভৃতি যে সকল গুণের সমাবেশ মানুষকে নেতৃত্বের বরণীয় আসনে প্রতিষ্ঠা করে, তাহার অভাব বশতঃ কতকগুলি লোকের মধ্যে অজ্ঞ জনসাধারণের অমার্জ্জিত মনে ঈর্ষ্যা, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি হীনবৃত্তিকে উস্কানি দিয়া নেতৃত্বরক্ষার অপচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বিভ্রান্ত জননায়কদিগের অপচেষ্টায় মানুষ যেখানে ঈর্ষ্যা-বিদ্বিষ্ট এবং হিংসা ও জিঘাংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে তাঁহার মত শান্তিপ্রিয়, সমদর্শী বৈজ্ঞানিকের কথা বলা বিড়ম্বনাই হইবে। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সক্রিয় রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। প্রফুল্লচন্দ্র সক্রিয় রাজনীতি বর্জ্জন করিয়া চলিতেন।

কিন্তু যখনই কোন রাজনীতির মঞ্চ হইতে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ভাবে তাঁহার নিকট আহ্বান আসিয়াছে, সে আহ্বানে প্রফুল্লচন্দ্র

তৎপরতার সহিতই সাড়া দিয়াছেন। ১৯১৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 'রাউলাট আইনের' প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, এই সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র শ্রোতা হিসাবে সেই জনতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সম্মুখে পাঠাইয়া দিল। দেশবন্ধু দাশের পাশেই তিনি আসন গ্রহণ করেন। সকলের বিশেষ আগ্রহে প্রফুল্লচন্দ্র বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ভাবের অতিশয্যে কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া চারিদিকে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস ও অবিরত বন্দেমাতরম্ ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—
"I have not the remotest idea that I will have to address here the meeting even for a single moment. I have come as a mere spectator. I am a man of the Laboratory, but I feel that there are occasions which demand that I shall leave my test tube to attend to the call of my country."

১৯২৫ সালে কোকনদে জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। মহম্মদ আলি ঐ সভায় নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন। দর্শক ও প্রতিনিধি হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতির অনুপস্থিত কালে তাঁহার ইচ্ছায় এবং প্রতিনিধিদিগের সমর্থনে প্রফুল্লচন্দ্রকে কিছু সময়ের জন্য ঐ রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র রাষ্ট্রীয় সমিতির কয়েকটি জেলা সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে খুলনায়, ১৯২৪ সালে উৎকলে, এবং ১৯২৭ সালে সাতক্ষীরা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের রাজনীতিক ধারণা যাহাই হউক না কেন, দেশবাসী প্রফুল্লচন্দ্রকে কত গভীর শ্রদ্ধা করিত এবং তিনি দেশবাসীর নিকট কি ভাবে প্রতিভাত হইতেন, তাহা এই সকল কার্য্য দ্বারা, আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু জাতির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার মনের সম্পূর্ণ পরিচয় উহার দ্বারাই আমরা পাই না। মহাপুরুষদিগের চিত্তলোক সমুদ্রের ন্যায় বিশাল। এখানে ভাবের তরঙ্গ উঠে। তাহার যে গুলি সংসারের তটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহা দিয়াই বিক্ষোভের স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি।

১৯২১ সালে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও নদীয়ার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় যখন জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিতে আসিয়াছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা যখন বলিলেন—“ডাক এলে, তখন আর কেউ ঘরে থাকতে পারে না। দেশের ইতিহাসে এমন দিন আর আসে নি।” তখন এই সংযত বৈজ্ঞানিকের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—“এমন স্বার্থত্যাগী সন্তানকে বক্ষে ধারণ ক’রে বঙ্গ জননী গৌরবিনী। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সাফল্য লাভ কর।”

আবার ১৯২৫ সালের জুন মাসে গান্ধীজীর বঙ্গভ্রমণ কালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র খুলনাবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য যে সময় খুলনায় উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু-সংবাদের তার পাইয়া তিনি শোক-মথিত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, “বাংলা আজ বিধবা হলো।” তারপর চিত্তরঞ্জনের

চিতাগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হইল, তখন তাঁহার স্মৃতিতর্পণে প্রফুল্লচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমগ্র বিশাল অন্তরলোক যেন ভাষায় রূপায়িত হইয়া বাহিরে প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "যেন তাঁর চিতাবাষ্প সমগ্র ভারতের আকাশে বাতাসে মিলাইয়া গিয়া, নিঃশ্বাসের সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাঁহার সুমহান্ আদর্শে ও অনুরাগে প্রদীপ্ত, প্রতিভা ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলে, ভারতের জননীগণ যেন এই প্রকার সন্তানই গর্ভে ধারণ করেন।"

১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। ইহার প্রতিনিধি সভায় ভারতের লক্ষ্য "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন" অথবা "পূর্ণ স্বাধীনতা" হইবে—ইহা লইয়া প্রবল মতভেদ হয়, পণ্ডিত মতিলাল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের পক্ষপাতী, আর তাঁহার পুত্র জহরলাল পূর্ণস্বাধীনতাকামী। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার গবেষণাগার হইতে পিতাপুত্রের এই অভিনব দ্বন্দ্বের কথা শুনিলেন। একসুরে বাঁধা অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একটি বাজিয়া উঠিলে, অপরগুলিও যেমন বাজিয়া উঠে, তেমনি একের মহত্ত্ব দৃষ্টে অপর হৃদয়ও মহত্ত্বে অনুরণিত হইয়া উঠে। সমধর্ম্মী চিত্তের স্বভাবই এইরূপ। প্রফুল্লচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পরদিন তিনি সভায় যোগদান করিলেন এবং প্রকাশ্য সভায় ভাবের বিহ্বলতায় জহরলালকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

১৯২৪ সালে গান্ধীজী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রকে যে তার করেন, তাহার উত্তরে প্রফুল্লচন্দ্র যাহা লিখিয়া

ছিলেন, তাহাতে প্রফুল্লচন্দ্রের রাজনৈতিক মনোভাব যেন তাঁর অজ্ঞাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

"Every one is for a royal road to Swaraj and would avoid the thorny and tedious path. It is not for me to pronounce any opinion on the advisability or otherwise of the return of Congressmen to Councils, but this much I may be permitted to say that if a portion of the energies which have been spent on the affair had been diverted to constructive programme sketched by you the way to Swaraj would have been by this time considerably shortened." (অর্থাৎ প্রত্যেকেই কঠিন কণ্টকাকীর্ণ পথ ত্যাগ করিয়া স্বরাজের রাজপথ অবলম্বন করিতে উৎসুক। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণ উচিৎ কি অনুচিৎ, তৎসম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে সমীচীন নহে। কিন্তু এইটুকু বলিতে পারি—যে উৎসাহ ইহাতে নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহার কতকাংশ যদি আপনার পরিকল্পিত সংগঠন কার্য্যে নিয়োগ করা হইত, তবে এতদিন স্বরাজের পথ অনেকটা নিকটতর হইত)।

নিপীড়ন ও অত্যাচারের বোঝা মাথায় লইয়া দূরায়িত লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া দেশসেবার দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিয়াছে যাহারা, তাহাদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ও মমতায় প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলন পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় কখনও বর্ষার বিরাট প্লাবনের মত দেশব্যাপী হইয়া, কখনও গ্রীষ্মের শীর্ণধারার

মত নামমাত্র বজায় থাখিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। দিনের পর দিন তিনি ইহার গতি লক্ষ্য করিয়াছেন। ব্রিটিশ উদারতায় নির্ভরশীল এডিনবারার ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ জাতির অসহায়তা ও দৈন্য এবং ব্রিটিশের অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্য দিয়া আমূল পরিবর্ত্তন লাভ করে। বার্দ্ধক্যে এই রোগজীর্ণ স্থবির বৈজ্ঞানিকের দেশজোড়া অন্তরে কোন্ স্বপ্ন সাফল্যের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিত! কোন্ অনাগত দিনের অরুণোদয়ের রাঙ্গা আলোয় দেশমাতৃকার মহিমময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বসুষমামণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে—তাহারই কি তীব্র আশা-আকাঙ্খায় তাঁহার চিত্তলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিত—তাহা যেন আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই। এই অরাজনীতিক প্রফুল্লচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখিয়া কোন ইউরোপীয় বলিয়াছিলেন—"গান্ধী আর দুইজন পি. সি. রায় সৃষ্টি করিতে পারিলে, এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করিতে পারিতেন।" প্রফুল্লচন্দ্র যদি বৈজ্ঞানিক না হইয়া রাজনীতিক হইতেন, তিনি নিঃসন্দেহে জাতির পুরোভাগে থাকিয়া সমস্ত সঙ্কটের মধ্য দিয়া জাতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারিতেন।

এইবার আমরা প্রফুল্লচন্দ্রের রচনাগুলির সমালোচনা করিব, আমরা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার রচনাগুলিকে সাহিত্য আলোচনার পৃথক পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট না করিয়া উহাদিগকে তাঁহার সমাজের মঙ্গল প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করিলাম; কারণ সাহিত্য সৃষ্টির বিশুদ্ধ প্রেরণা লইয়া ঐ গুলি লিখিত নহে। রচনাগুলি উদ্দেশ্য-মূলক। প্রফুল্লচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগ তাঁহার চিন্তার ধরণটিকে সাহিত্য রচনার অনুকূল করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং যাহাই তিনি রচনা করিয়া

ছেন, তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার স্পর্শে তাহাই সাহিত্যের মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার রচনাগুলিকে আমরা প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পারি—(১) বিজ্ঞান সম্পর্কীয় ও (২) সমাজ সম্পর্কীয়। বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা-মূলক রচনাগুলি বহু দেশী ও বিদেশী সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছে। "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস" তাঁহার বহু বর্ষের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাহির হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ও তাঁহার অন্যান্য রচনাগুলি পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার কি অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল, এই সকল রচনা তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাঁহার সমাজসম্পর্কীয় লেখাগুলি বিশ্লেষণ-মূলক। জাতির জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহার বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তিনি তাহার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যেখানেই কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিদ্যমানতায় সমাজদেহে দুর্ব্বলতার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার ক্ষুব্ধ অন্তর লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার লেখাগুলি সমাজের সমালোচনায় পূর্ণ। কিন্তু যুক্তি-মূলক রচনার ন্যায় তাহার ছন্দ দীর্ঘ এবং গতি প্রশান্ত নহে; তাঁহার ভাবাবেগময় অন্তরের ক্ষোভের স্পর্শে তাঁহার ভাষা উচ্ছ্বাসময়, শ্লেষযুক্ত এবং বেগবান।

বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমিক অধঃপতন তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। জাতিভেদ মানুষের জীবনে যে সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা তাঁহার চিত্তকে ব্যথিত করিয়াছিল। বস্তুগত সমীক্ষা হইতে

বিজ্ঞানের জন্ম। এদেশের মনীষা বস্তুবিমুখ থাকিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধির চুলচেরা বিচারের আত্মম্ভরিতায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, অন্তর্মুখীন চিন্তাধারার সহিত বাহিরের সংসারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সংসারে তাহার আত্মপ্রসারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র জাতির আসন্ন দৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালীর শক্তি ও মেধার এই অপরিমেয় অপব্যয়ে পীড়া বোধ করিয়াছিলেন। সমাজের অস্পৃশ্যতা কণ্টকের ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিত। এই সকল পূঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বেদনার প্রেরণায় তিনি লেখনীধারণ করিয়াছিলেন। “বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার,” “অন্নসমস্যা” ও “জাতিভেদ” প্রভৃতি গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বাঙ্গালীকে উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার “আত্মচরিত” প্রত্যেক দেশবাসীরই অধ্যয়ন করা উচিত। ইহা যে শুধু বাঙ্গালীকে প্রেরণা জোগাইবে তাহাই নহে, বহুতথ্যের সমাবেশে ইহা এতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, মাত্র এই একখানি গ্রন্থপাঠে মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা বহুমুখে সম্প্রসারিত হইবে।

প্রফুল্লচন্দ্র নিজেকেই দেশের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর্থিক দানের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আত্মস্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহার জীবন আবর্ত্তমান, বিপুল আর্থিক দান তাঁহার জীবনের পক্ষে বড় কথা হইতে পারে। কিন্তু জাতির স্বার্থ কেন্দ্র করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের সমগ্র জীবন আবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর্থিক দান তাঁহার জীবনের একটি নগণ্য বৈশিষ্ট্য মাত্র। কিন্তু তাঁহার দানের পাত্র ও পরিমাণ দেখিয়া আমরা তাঁহার দানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার নিজের প্রয়োজন অতি সামান্য ছিল। সামান্য

আহার্য্য এবং দুইখানি মাত্র ধুতি ও দুইটি কামিজ হইলেই তাঁহার চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার উপার্জ্জিত অবশিষ্ট বিপুল অর্থ—তিনি জনহিতে দান করিয়া গিয়াছেন। এই দানের পরিমাণের কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রার্থী কখনও বিফল হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ফিরে নাই। প্রফুল্লচন্দ্র দানেই অর্থের সার্থকতা দেখিয়াছিলেন, অথবা দান তাঁহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল। ছাত্রমণ্ডলীর শিক্ষাব্যপদেশে, দীন-দুঃখী-পীড়িতের সেবায় ও অন্যান্য লোকহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার মাসিক ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত থাকিত। বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ম্মচারী শরৎচন্দ্র দাস ঐ তালিকানুযায়ী অর্থ বণ্টন করিয়া দিতেন।

১৮৮৯ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র বাংলা দেশের দীন ছাত্রদিগের সাহায্যকল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের স্বগ্রামে ১৯১৮ সালে স্থাপিত ও কোম্পানীর আইনানুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত শিক্ষা পরিষদে (Education Society) বেঙ্গল কেমিক্যালের ১০,০০০৲ টাকার শেয়ার এবং ১৯২১ সালে রেজেষ্ট্রীকৃত কাটিপাড়া সেবাশ্রমে ১০০০৲ টাকার শেয়ার দান করেন। প্রতি বৎসর—ডিভিডেণ্ড স্বরূপ যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা এডুকেশন সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ রাড়ুলি ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু পল্লীর শিক্ষা ও জনকল্যাণকর কাজে ব্যয় করেন। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-কলেজের পালিত অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য বেতন বিজ্ঞান-চর্চ্চার উন্নতিকল্পে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করেন। ইহার দ্বারা 'স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ ফেলোসিপ' নামে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত তহবিলে তাঁহার

মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১,৩০,০০০৲ টাকার অধিক জমা ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৯২২ সালের মার্চ্চ মাসে “নাগার্জ্জুন প্রাইজ” নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাসায়নিক গবেষণার জন্য এবং ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ‘আশুতোষ প্রাইজ” নামে প্রাণী-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণার জন্য দশ হাজার করিয়া বিশ হাজার টাকা দান করেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, বেনারস, ঢাকা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়া তিনি যে পারিশ্রমিক পান, তাহা ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। চরকা ও খদ্দর প্রচলনের জন্য তাঁহার দানের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে পুষ্ট হইয়াছে। মোট কথা, তিনি নিজের জন্য বা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতির জন্য কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই। তাঁহার উপার্জ্জিত সমুদয় অর্থ ই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র

বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" তিনি যে অর্থেই এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকুন, আমরা ইহার দ্বারা বুঝি—মনুষ্যত্বই জীবনের সর্ব্বোত্তম গৌরব। বৈজ্ঞানিক দস্যু হইতে পারেন, সমাজ-সেবা যশোলিপ্সার দ্বারা মলিন হইতে পারে, সাহিত্যিকের চরিত্রগত অন্য দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যত্ব অকলঙ্ক—ইহা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল—ইহার সংস্পর্শে জীবনের সমুদয় বৈশিষ্ট্যই প্রোজ্জ্বল ও দীপ্তিশীল হইয়া উঠে।

বস্তুতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞায় মনুষ্যত্বকে আমরা অভিহিত করিতে পারি না। কোন নির্দ্দিষ্ট পথে ইহা বাইরে প্রকট হয় না। একটি রুদ্রোজ্জ্বল বা মধুরোজ্জ্বল ব্যাপ্তিতে মানুষের সকল কাজের উপর আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া সকল কাজের উপর ইহা ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট ছাপ আঁকিয়া দেয়। প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞান সেবা তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম,—কিন্তু মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র দেশজননী-ন্যস্ত পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবে গভীর আদর্শ-নিষ্ঠার সহিত এই বিজ্ঞান-সেবা ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী প্রফুল্লচন্দ্র বিরাট পরিকল্পনা এবং অপূর্ব্ব সংগঠন শক্তিদ্বারা বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন; কিন্তু মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের নেপথ্যে বাস্তব রিক্ততার মধ্যে আপন মনুষ্যত্বের অপার ঐশ্বর্য্যের কোলে আসীন রহিলেন। এই ভাবে তাঁহার প্রত্যেক বিশিষ্ট কর্ম্মধারার মধ্য দিয়া মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যটুকু সকল ক্ষেত্রে আলোচ্য কর্ম্মধারার অনুগামী গুণ হিসাবে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু

শিক্ষকতা, বৈজ্ঞানিকতা, সমাজসেবা প্রভৃতির মধ্যে মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তাঁহার জীবনের সকল কর্ম্মধারাকে প্রদীপ্ত করিয়াও মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র—বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র—মনুষ্যত্বের বিমল মহিমায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর হৃদয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত; প্রফুল্লচন্দ্র—যিনি পিতার বাৎসল্যে, বন্ধুর আপ্যায়নে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; প্রফুল্লচন্দ্র—পল্লীর নিরক্ষর মূর্খ চাষী যাঁহার নামে তাহার গাছের প্রথম ফলটি উৎসর্গ করিয়া রাখিত—পল্লীর বধূরা নিজেদের হাতে পাক-করা "পুঁইশাক চচ্চড়ি" যাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য আগ্রহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত!

সত্যই প্রফুল্লচন্দ্র গভীর মননশীলতা ও শুদ্ধ সংস্কৃতির উচ্চতম মানসিক স্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সুলভ প্রাচুর্য্যে আপনাকে সকলের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। নিরক্ষর মূর্খ চাষী হইতে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট তিনি সুগম ও সহজবোধ্য ছিলেন। এই দিক দিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কতকটা যেন গান্ধীজীর সহিত উপমেয়। সুভাষচন্দ্র, জহরলাল, ইঁহাদের নিকট যাইতে হইলে আমাদের যেন মনের তোলা পোষাক পরিয়া যাইতে হয়—মন যেন দূর হইতে সম্ভ্রম জানাইয়া ফিরিয়া আসিতে চায়। আর গান্ধীজী, প্রফুল্লচন্দ্র? ইঁহারা যেন নিত্য পূজার দেবতা—আমাদের দুঃখ-দৈন্য-গ্লানি-ভরা মন লইয়া ইঁহাদের পার্শ্বে যাইয়া আমরা বসিতে পারি—ইঁহাদের পাশে বসিয়া দিনের পর দিন আমাদের দুঃখীর জীবনের কাহিনী শুনাইতে আমাদের মন যেন উদগ্রীব হইয়া উঠে। জনসাধারণের মনের গঠন ইঁহারা জানেন। তাহাদের মনের অস্পষ্ট ভাব তাহাদের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা ইঁহাদের অদ্ভুত। তাই প্রফুল্লচন্দ্র যখন কিছু বলিয়াছেন, জনসাধারণের

নিকট তাহা নিজের মনের কথা নিজের মুখে বলিয়া নিজের কাণে শোনার মত মনে হইত ; তাহাদের মন, ভাব ও ভাষার এই সঙ্গতি-জনিত আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিত। সুভাষচন্দ্র, জহরলাল—ইঁহারা যেন মনুষ্যত্বের বিরাট শৈল—মহিমায় গাম্ভীর্য্যে মনে সম্ভ্রম জাগায়। গান্ধী, প্রফুল্লচন্দ্র—ইঁহারা যেন মনুষ্যত্বের স্রোতস্বিনী—নদীর সুস্বাদু জলধারার ন্যায় স্বীয় মনুষ্যত্বের ক্ষীরধারায় মানব হৃদয়ের বেদনা-দগ্ধ উষর মরু ক্ষেত্রকে স্নিগ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলে। একজনের বিশাল ভাবলোকে—দুর্গত-অত্যাচারিত মানবজাতির দুঃখকষ্ট কল্পনার যাদু-তুলি স্পর্শে মর্ম্মন্তুদ বেদনার একখানি করুণ চিত্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহার মধ্যে দেশের জন্য জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের রূপটুকু বিধৃত হইলেও, তাহা এক বৃহত্তর পরিমণ্ডলের অংশ বিশেষ মাত্র ; আর একজন অভাবে, দৈন্যে, অনশনে, রোগে, শোকে মাটির বুক যেখানে আর্ত্তচীৎকারে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহারই মাঝখানে দাঁড়াইয়া সমবেদনায় গলিয়া তিলে তিলে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া উঠিয়াছেন। একজন অত্যাচারের প্রতিবাদে মানুষের দেবতা হইয়াছেন, আর একজন অত্যাচারিতের সমবেদনায় দেবতার আসন হইতে নামিয়া মানুষের সুখ দুঃখের সাথী হইয়া মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। একজনের আদর্শ ভাবগত, অপরের আদর্শ বস্তুগত এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি প্রফুল্লচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র না হইলে, গান্ধী হইতেন।

এই মহাপুরুষের জীবন যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাহা নব নব ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার জীবন যেন বাঙ্গালী জাতির দিগ্দর্শন যন্ত্র। ইহা বাঙ্গালী জাতির জীবনে যাহা কিছু

শ্রেয় এবং প্রেয়, তাহার অভিমুখী করিয়া জীবনের পথ নির্দ্দেশ করে। তাঁহার জীবন যেদিন বাঙ্গালী জাতির জীবনে—তাহার চিন্তায় এবং কর্ম্মে সত্য হইয়া উঠিবে, যেদিন জীবন দেবতার অপূর্ব্ব আহ্বানে বাঙ্গালী জাতি তাহার শিথিল ও বিক্ষিপ্ত জীবনকে পৌরুষে, ঔদার্য্যে এবং মানবতায় সঞ্জীবিত করিয়া, নিষ্ঠায় ও সাধনায় একমুখী করিয়া, তাহার অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত পঙ্গুতা দূর করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবে, সেই দিনই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ধারণ সার্থক হইয়া উঠিবে। আমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার মানুষী রূপটি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

সংঘাত উপস্থিত হইলে বাধাকে বিচূর্ণ করিয়া চলার পথ করিবার উপযোগী উগ্র বীর্য্যবত্তা দিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের মনুষ্যত্ব গঠিত হয় নাই। তাঁহার দৈহিক গঠনও তাহার অনুকূল ছিল না। তিনি হৃতমান হইয়াও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রফট্ সাহেবের কথার প্রত্যুত্তরে অপরিসীম ধৈর্য্য দিয়া তিনি "বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্" গড়িয়া তুলিলেন, যেখানে এই এডিনবারায় শিক্ষা প্রাপ্ত ডাক্তারের আদেশের প্রতীক্ষায় মাসিক হাজার টাকা বেতন-প্রাপ্ত ম্যানেজার সর্ব্বদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সংকল্প মৃদুভাবে ক্রিয়াশীল হইলেও, ইহার লক্ষ্যাভি-মুখী গতি সুনিশ্চিত এবং অনিবার্য্য। এই ভগ্নস্বাস্থ্য ঋজুদেহ পুরুষটির সকল সংকল্পই উগ্রতা-বর্জ্জিত, কিন্তু অধ্যবসায়ে ও ঐকান্তিকতায় সার্থক-কাম।

অভিমান-শূন্য মন কোন ব্যাপারেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে জানে না। প্রফুল্লচন্দ্র নিরভিমান ছিলেন। অভিমান সকল কাজের মধ্য দিয়া

আপনাকে প্রচার করিতে চায়, সকল কাজের মধ্যে "আমি" মনোহর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠুক, ইহাই তাহার কাম্য। প্রফুল্লচন্দ্র অভিমান সংহরণ করিয়া আমিত্বকে জাতির মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা যাহাকে আত্মত্যাগ বলি, প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে তাহা ছিল আত্মসম্প্রসারণ। ত্যাগ কথার ভিতর সংযম বা মানসিক আয়াস-স্বীকারের ঈঙ্গিত থাকে। প্রফুল্লচন্দ্রের ভিতর তাহা ছিল না। তিনি সকলের মধ্যে আপনাকে পাইয়াছিলেন, তাই আনন্দের সহজ প্রেরণায় আপনাকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত রাখিয়া পরের কল্যাণে দান করিবার ঔদার্য্যের মধ্যে যে আত্ম-বিলাস লুকাইয়া থাকে, তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার দানশীলতা ছিল হৃদয়ের একটি অনিবার্য্য বৃত্তি। মৌখিক সহানুভূতি তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্ম ছিল না—পরের বেদনা তাঁহার অনুভূতিতে নিজের বেদনার ন্যায় তীক্ষ্ণ ও তীব্র হইয়া উঠিত। সেই বেদনার প্রেরণায় তাঁহার হস্ত সাহায্য করিবার জন্য স্বতঃই প্রসারিত হইত। তাঁহার জীবন দেবতা বুঝি তাঁহার নিকট সর্ব্বস্বই চাহিয়াছিলেন; তিনিও দু'হাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব—এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত পরের কল্যাণে দান করিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিবাহ করেন নাই। পুত্র পৌত্রাদি বংশ পরম্পরার মধ্যে নব নব রূপে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যাকুল আকাঙ্খা কখন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করে নাই। সৃজন প্রবৃত্তি জীবনের সহজ ধর্ম্ম। প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যেও এই ধর্ম্ম ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি স্থুলসৃষ্টির বহু উর্দ্ধে ভাবলোকে উন্নীত হইয়াছিল। উচ্চ মানসিক স্তর হইতে এই সৃষ্টির ইষনা তাঁহার জীবনকে দোলা দিয়াছিল। তাই

প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কর্তা নহেন। তিনি বৈজ্ঞানিকের স্রষ্টাও। অসংখ্য বিজ্ঞানী শিষ্যের মধ্য দিয়া প্রফুল্লচন্দ্র আপনাকে বহুরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই বৈজ্ঞানিকের শিষ্যপরম্পরা হয়তো একদিন ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ রচনা করিবে এবং তাহাদের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের জলগণ্ডুষে এই বৈজ্ঞানিকের আদিপুরুষ, 'গোষ্ঠীপতি' প্রফুল্লচন্দ্রের অবিনাশী আত্মা অমৃতলোকে বসিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন।

পোষাক পরিচ্ছদে প্রফুল্লচন্দ্র আদর্শ বাঙ্গালী ছিলেন। ১৯০১ সালে মহামান্য গোখেলের সঙ্গী হইয়া গান্ধীজী প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন শ্মশ্রুগুম্ফ বিমণ্ডিত, ধুতি-পিরহান-সম্বল প্রফুল্লচন্দ্র—বিজ্ঞান কলেজের একটি অনাড়ম্বর কক্ষে তাঁহার একক জীবনের সংসার; সুপ্রচুর উপার্জ্জন, কিন্তু তাহা হইতে নিজের অত্যন্ত সাধারণ জীবন-যাত্রার জন্য সামান্য কয়েক টাকা মাত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট ছাত্র ও দুঃস্থের কল্যাণে বিলাইয়া দেন। গান্ধীজী সম্ভবতঃ হতাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই হতাশা তাঁহার হর্ষেরই কারণ হইয়াছিল। গান্ধীজী তখনও চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর দারিদ্র্যের প্রতীক চীর বস্ত্র গ্রহণ করেন নাই। উচ্চ—বিশেষতঃ বিদেশী শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে বিলাতী পোষাক ও হাবভাব তখনও দেশবাসীর নিকট আদরণীয় ছিল। গান্ধীজীর সম্মোহিনী বাণীর অনুপ্রেরণায় তাহারা তখনও দেশবাসীর অঙ্গ ও স্বভাব হইতে খসিয়া পড়ে নাই। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশী পোষাক ও হাবভাবকে কোন দিনই প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবাধীনে প্রফুল্লচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল সত্য, ইংরাজী সাহিত্য তাঁহার সুপ্ত

সাহিত্যিক চেতনাকে উদ্বোধিত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ, বাঙ্গালীর আলাপআচরণ তাঁহার মহৎ চরিত্রের মহত্তর অলঙ্কার রূপে তাঁহার নিকট চিরদিনই সমান আদরনীয় ছিল।

বাল্যসুলভ চপলতা বৃদ্ধ বয়সেও কোন দিন তাঁহাকে পরিহার করে নাই। নাগরিক জীবনের মার্জ্জিত চপলতা ইহা নহে। ইহা সরল গ্রাম্য মনের চপলতা—বুঝি বা বন্যাও। প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক উপায়ে বাড়িয়া-ওঠা প্রাণ-প্রাচুর্য্যে উল্লম্ফমান বন্য পশুর মত সে মন। তাঁহার দরজা অবারিত, দর্শনাকাঙ্ক্ষীর নিত্য ভিড়। তাঁহার স্বভাবের সহিত পরিচিত নহে—এমন কোন যুবক তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে, সত্যই তাহাকে বিব্রত হইতে হইত। প্রফুল্লচন্দ্র যুবকটিকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার পেশীগুলি মলিয়া ডলিয়া, তাহার বুকে পিঠে কিলবৃষ্টি করিয়া—তাহাকে একেবারে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার হাত হইতে না হইলে, এই অশিষ্টাচরণ যে কোন লোকের নিকটই সুনিশ্চিত ক্রোধের কারণ হইত। এইভাবে তাঁহার বন্য মনের সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়া পরিচয়ের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইত। ক্রমে সেই বন্য মনকে সংহত করিয়া বৈজ্ঞানিক-ব্যবসায়ী-পরামর্শদাতা প্রফুল্লচন্দ্র জাগিয়া উঠিতেন।

পল্লী চিরদিনই যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। পল্লীর আবহাওয়ায় তিনি যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন, এমন আর কোথাও নহে। বাল্যে কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে তিনি মধ্যে মধ্যে রাড়ুলি যাইয়া পল্লী আবহাওয়ার নির্ম্মল বাতাসে মনকে পবিত্র করিয়া আসিতেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনেও তিনি বৎসরে অন্ততঃ একবার তাঁহার কলিকাতার শ্রদ্ধা ও সম্মানের রাজত্ব হইতে রাড়ুলি-কাটিপাড়া

পল্লীর 'গুহক'-দিগের দাদা-কাকা-মামা-জ্যেঠার-মিতার রাজত্বে ফিরিয়া যাইতেন। হরগোঁজার বনাকীর্ণ তটরেখার তলে কপোতাক্ষের কালো নীরধারা,—অদূরে প্রান্তর, দিগন্তে নীলহরিতে মেশামিশি হইয়া গিয়াছে—আঁকা-বাঁকা সরুপথ পল্লীর নির্জ্জন নিরালা দিয়া কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। ইহারই স্থানে স্থানে মানুষের বসতি—ক্বচিৎ কোথাও আড়ম্বর উঁকি মারিতেছে; প্রায় সর্ব্ব স্থানেই দারিদ্র্যের নগ্ন রূপ। ইহার অধিবাসীরা? অল্পই তাহাদের অভাব; তাহাও সম্পূর্ণ পূরণ হয় না। ইহারা ক্রোধে ক্রুদ্ধ হয়, আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, বেদনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। এখানকার অধিবাসীরা দুই দিন তালের মজায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তৃতীয় দিন হরিশ্চন্দ্র সাজিয়া সসাগরা পৃথিবী দান করিতে পারে। ইহাই প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম-পল্লীর পরিবেশ! বৈজ্ঞানিকের খোলস ছাড়িয়া এখানে আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র মানুষ হইয়া বাঁচিয়া উঠিতেন!

ফুনুর (ইহাই তাঁহার বাল্যকালের নাম) আগমনে গ্রামের মধ্যে একটি প্রীতির শিহরণ জাগিয়া উঠিত। সম্মান ও শ্রদ্ধায় ভারাক্রান্ত সঙ্কুচিত আড়ষ্ট প্রীতি ইহা নহে। যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রীতির উচ্ছ্বাসে ভাই ভাইকে বক্ষে ধারণ করে—বন্ধু বন্ধুকে আলিঙ্গন করে—ইহা সেই প্রীতি—বাধাহীন গ্রাম্য মনের পুলকাকুলতা। এখানে তিনি শিশুর পরম নির্ভরতায় মাতৃ-অঙ্কে শুইয়া পড়িতেন, বাল্যগুরুর পদধূলি লইতে বালকের মতই ছুটিয়া যাইতেন—পল্লীবধূর প্রীতিস্নিগ্ধ হাসির অভ্যর্থনার মধ্যে প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে কুশলবার্ত্তা লইয়া ফিরিতেন।

গৃহে অবস্থানকালে প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিদিন নিয়মিত নৌকাযোগে বাহির হইতেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে যুবকেরা নৌকায় আসিয়া তাঁহার

সহিত মিলিত হইত। সে কি হৃদয়ের উদ্বেলতা—আনন্দের মাতামাতি! সঙ্গীতে—কলহাস্যে আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিত। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র—স্যার প্রফুল্লচন্দ্র সেই পুলক বন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইত! বঙ্গজননীর চির আদরের সন্তান মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার নগ্ন সৌন্দর্য্যে জাগিয়া উঠিতেন। স্থানে স্থানে নৌকা চাপাইয়া তিনি ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিতেন—পরিপূর্ণ নিঃশ্বাসে মাতৃ-অঙ্গের সমস্ত সৌগন্ধটুকু বুঝি অন্তরে টানিয়া লইতে চাহিতেন। ইহাই প্রফুল্লচন্দ্রের মানুষী রূপ! ইহাই গুণের পর গুণ যোজনায় বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী, লোকশিক্ষক, সমাজসেবক প্রফুল্লচন্দ্রের মহামানবতার অনবদ্য চিত্রে রূপায়িত হইয়াছিল।

সত্যই, জাতীয় দুর্গতির মসীলিপ্ত পটভূমিকার উপর প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন একখানি সুসমঞ্জস ছবির ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিধাতা বুঝি তাহার অমর তুলি দিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখা ও বর্ণবিন্যাসে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা দিয়া এই ছবিখানিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবন যাত্রা, সর্ব্বদিক দিয়া একটি সুপ্রণালীবদ্ধ কর্ম্মসূচী ও আদর্শ নিষ্ঠা তাঁহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। ভ্রমণের উদ্যোগে একটি সূচী পর্য্যন্ত তাঁহার মনোযোগ এড়াইতে পারিত না। তাঁহার একক জীবনের গৃহস্থালীতে এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা ছিল না। সময় বা অর্থের এতটুকু অপব্যয় তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। মিতাহার ও মিতাচার তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। তাঁহার অসাধারণ মনঃসংযোগ শক্তি ছিল বলিয়া দেশের চিন্তা তাঁহার বিজ্ঞান সাধনাকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটা শোভন-

ভঙ্গী, সুরুচি ও শালীনতা তাঁহার চরিত্রকে সঙ্গতি ও মাধুর্য্যে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। সর্ব্বোপরি একটা আর্য্য-মনোভাব—ত্যাগভূয়িষ্ঠ জীবনের সুর—নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরণা এবং আত্মসম্প্রসারণের আনন্দ তাঁহার সকল কার্য্যের উপর আদর্শের একটি বিশিষ্ট ছাপ আঁকিয়া দিয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র স্থানে স্থানে হিন্দুশাস্ত্রকে আক্রমণ করিয়াছেন—এই অনুযোগ অনেককে করিতে শোনা যায়—অনধিকারী হইয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা তাঁহার পক্ষে শোভন হয় নাই। হয়তো তিনি শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রের গোপ্তা ও ব্যাখ্যাতা যাঁহারা, তাঁহারাও শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ তিনি হয়তো খুঁজিয়া পান নাই। অপৌরুষেয় শাস্ত্র—সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের শাশ্বত সত্য তাহাতে নিহিত থাকিবেই। বস্তুতঃ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই শাস্ত্র ভারতের জাতীয় জীবনের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল এবং তাহার সকল কার্য্য ও চিন্তায় প্রেরণা জোগাইয়া জাতির প্রতিভাকে সজীবিত রাখিয়াছিল। সমাজের প্রত্যেক পরিবর্ত্তিত অবস্থার সমর্থনে যুক্তি শাস্ত্রের মধ্যেই মানুষ তখন খুঁজিয়া পাইত। কিন্তু যুগধর্ম্ম-পরিবর্ত্তিত জীবন ধারার সহিত শাস্ত্রের যোগ আজ কেবলই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে; জীবনের অগ্রগতির পথে সহায় না হইয়া সে পুনঃপুনঃ বাধার শৃঙ্খল সৃষ্টি করিতেছে; মধ্যযুগীয় তর্ক বিতর্কের ধূম্রজালের মধ্য দিয়া জাতি পিছন দিকে পায়ের-পাতা-জোড়া ভূতের ন্যায় জীবনের ক্ষেত্র হইতে দ্রুতগতিতে পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে; তাহারই আক্ষেপোক্তি প্রফুল্লচন্দ্র করিয়াছেন। বহুদিনের

পরাধীন জাতির নিপীড়িত ও জড় মনের উপর শাস্ত্রের মর্ম্মার্থের যে বিকৃত রূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, চলিতে যাইয়া যে অধঃপতন জাতির জীবনে প্রকট হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার মনকে তীব্রভাবে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল। শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য এই বিক্ষোভেরই অভিব্যক্তি।

এই মহান্ আর্য্যতাপসের দুর্জ্জেয় মানস লোকের সম্পূর্ণ রূপটুকু ফুটাইয়া তোলা তাঁহারই ন্যায় বিস্তৃত-মনা ব্যক্তি ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার অদৃশ্য অন্তর লোকে কোন্ গুণ কেমন করিয়া তাঁহার চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতেছিল—কোন্ অনুকূল মানসিক পরিবেশের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তাহারা বিকাশ লাভ করিতেছিল—চিন্তাকে যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়াও আমরা তাহার কুলকিনারা পাই না। মানুষের যত কিছু শিক্ষাদীক্ষা, বাহ্য ঘটনার সংস্পর্শে সমস্ত সংবেদন—তাহারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্য্যাস প্রতিনিয়ত অন্তরের মানুষটিকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে। প্রফুল্লচন্দ্রের মনুষ্যত্ব ঐ একই প্রকারে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের এই পরিপুষ্ট মনুষ্যত্বের প্রাণকোষটি ?—ইহা প্রফুল্লচন্দ্র কোথায় পাইয়াছিলেন? বঙ্গজননীর সৃজন-শক্তি কত যুগের সঞ্চয় দিয়া একটি প্রফুল্লচন্দ্র গড়িয়া তুলেন?—একজন বিবেকানন্দকে সৃষ্টি করেন?—একজন চিত্তরঞ্জন দেশবাসীকে উপহার দেন? পরাধীনা বঙ্গ জননী ও পূতগর্ভা বঙ্গনারীদের সৃষ্টির সমৃদ্ধি দেখিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া আসে, আর ইঁহাদের আবির্ভাবে বাঙ্গালী আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে।

শেষ জীবন

বাংলার মাটি রসাল। এখানে বৃক্ষলতা সবুজ শোভার মাধুর্য্য সম্পদে সহজেই বিকশিত হইয়া উঠে। কিন্তু শুষ্ক ক্ষেত্রের তীক্ষ্ণ আবহাওয়ার বৃক্ষাদির ন্যায় তাহারা কখনই সত্ত্ববান বা ঘাতসহ হয় না। মাটির গুণে মানুষও বুঝি চরিত্র মাধুর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়া দু'দিনের জন্য সংসারকে আমোদিত করে। আবার বাংলার বৃক্ষলতার ন্যায় দু'দিনে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া পড়ে। এদেশের বিবেকানন্দ—এদেশের চিত্তরঞ্জন বাংলার কত দিনের সম্পদ? পঞ্চাশ বৎসরের শক্তি পাঁচ বৎসরেই ঘনীভূত হইয়া অলৌকিক সার্থকতায় তাঁহাদের জীবনকে যেন বিকশিত করিয়াছিল! তাঁহাদের বিরাট ব্যক্তিত্বকে দীর্ঘকাল বহন করিবার মত শক্তি বাংলার জলবায়ুপুষ্ট দেহে বুঝি সম্ভবে না!

এই অল্পজীবীর দেশে যে দুই-এক জন বিরাট মহীরুহের ন্যায় দীর্ঘকাল স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া অক্ষুণ্ণ কর্ম্ম-শক্তি লইয়া জীবিত ছিলেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। প্রফুল্লচন্দ্র ৮৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষের দুই বৎসর তাঁহার প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় কাটিয়াছিল। তখনও বাংলার ও বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। যখনই কোন সুদূরপ্রসারী সমস্যা বাঙ্গালীকে বিব্রত করিয়াছে, তাঁহার অসুস্থের শয্যা হইতে তিনি তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া অথবা সাধারণ সভায় প্রেরণ করিয়া জাতিকে সাহায্য করিয়াছেন।

বার্দ্ধক্য-সুলভ দুর্ব্বলতায় তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তদুপরি অনিদ্রা রোগ তাঁহাকে স্থায়ীভাবে কষ্ট দিতেছিল। এই সময় তিনি কিছু দিনের জন্য খুলনার অন্তর্গত শ্রীপুরে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সরদারের গৃহে

অবস্থিতি করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি নিজের জন্মস্থান রাড়ুলি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ কত দেশ তিনি দেখিয়াছেন ; কিন্তু কপোতাক্ষীর ক্ষীরধারা নিষিক্ত খুলনার কথা মনে হইলে জীবন-সন্ধ্যাতেও তাঁহার চিত্ত আবেগময় হইয়া উঠিত।

এই সময় খুলনাবাসীদিগের উদ্যোগে খুলনা সহরে প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। বাংলার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন। রাড়ুলি ও কাটিপাড়ার অধিবাসীবর্গ এই সুযোগে তাঁহাদের অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য তাঁহার পায়ে নিবেদন করেন।

এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছেন। কিন্তু দেশবাসীর এই স্নেহের দাবী তাঁহার দরদী প্রাণ কোন ক্রমেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। তিনি সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে এই মহাপ্রাণ মনীষীর বাণী প্রচ্ছন্ন বেদনায় মন্থর—বিদায় বেলার সঙ্গীতের ন্যায় উদাস—আশা আকাঙ্খায় বিক্ষুব্ধ স্নেহাতুর প্রাণের সম্পূর্ণ রূপ তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইবার প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পরম আদরের বিজ্ঞান কলেজে বাস করিতে লাগিলেন। এই বিজ্ঞান কলেজই তাঁহার সাধনার প্রকট মূর্ত্তি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তিনি এই স্থান ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। এইখানেই ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন অপরাহ্ণ ৬ টা ২৭ মিনিটের সময় তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। তিনি যদি পৌরাণিক যুগে জন্মগ্রহণ করিতেন, হয়তো কোন নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব তাঁহার জন্মের দিন সূচিত করিত ; হয়তো

কোন আকাশ বাণী তাঁহার জীবনের বিরাট সম্ভাবনার কথা আভাসে জানাইয়া দিত ; হয়তো এই দেবাংশ সম্ভূত মহাপুরুষ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গ্রাম্য বটবৃক্ষমূলে পূজা ও অর্চ্চনা লাভ করিতেন। পল্লী কবি তাঁহার নামে স্তোত্র রচনা করিত, পল্লী বধূ তাঁহার নামে বটবৃক্ষমূলে দীপ জ্বালাইয়া দিত। কিন্তু এযুগে তাহা সম্ভব নহে। তিনি এই মাটির পৃথিবীতে সহজ মানুষের মত স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল প্রতিভার দীপ্তিতেই তাঁহার জীবন ভাস্বর হয় নাই। তিনি পরম সহিষ্ণুতায় তিলে তিলে তাঁহার মনুষ্যত্বের পরম সম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই মনুষ্যত্ব তিতীক্ষায় ঐশ্বর্য্যশালী, প্রেমে মাধুর্য্যময়, জ্ঞানে উজ্জ্বল এবং সংযমে ও অধ্যবসায়ে ফলবান।

আজ বাঙ্গালী প্রফুল্লচন্দ্রকে হারাইয়াছে। হারানোর দুঃখ বাঙ্গালীর বুকে তীক্ষ্ণ ও গভীর ভাবে বাজিয়াছে। এ দুঃখ বাঙ্গালী ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু দিনের পর দিন—বৎসরের পর বৎসর—যুগের পর যুগ ধরিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবেন—বাঙ্গালীর জীবনকে প্রভাবিত করিবেন। অশরীরী প্রফুল্লচন্দ্র নব নব ব্যঞ্জনা লাভ করিয়া ভাব রূপে বাঙ্গালীর চিত্তে অনুপ্রেরণা আনিয়া দিবে। হৃদয়ের মাধুর্য্য ও মনের কল্পনা দিয়া বাঙ্গালী প্রফুল্লচন্দ্রকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইবে। এই ভাবে নৈর্ব্যক্তিক প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচ্ছিন্নতা হারাইয়া কালে একটি সর্ব্বজন-কাম্য আদর্শের ভাবময় সত্তায় রূপান্তরিত হইয়া যুগ যুগান্ত ধরিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়-পীঠে পূজা পাইতে থাকিবেন।

সম্পূর্ণ